প্রেমচন্দ

# পঞ্চ পরমেশ্বর

অনুবাদ ॥ সুবিমল বসাক




বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৭০০ ০৭৩



প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৩৭

প্রকাশক : ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :
শ্রীশিশির কুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০/বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

দাম : চোদ্দ টাকা

শীলা দে

অসিতাভ দত্তগুপ্ত

## প্রকাশকের নিবেদন



তাঁর ভাবনার প্রবাহ হিন্দী সাহিত্যের পরিধি পেরিয়ে এক সময় ভারতীয় সাহিত্যের সীমানায় প্রবেশ করল।

**আজ সেই স্রোতধারা বিশ্ব-সাহিত্যের দিগন্তকে স্পর্শ করেছে।**

মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের নানা সংঘাত সংগ্রাম, চেতন অবচেতন মনেব বিচিত্র আবর্ত তাঁর সাহিত্যে সুস্পষ্ট ও সত্যনিষ্ঠভাবে মূর্ত। মানুষই তাঁর রচনার আদি ও শেষ উপাদান।

সাহিত্য-সমাজের এই সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও স্বীকৃত কথাকারের শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে উনিশ-শ' আশি খ্রীষ্টাব্দে। এই শতবর্ষের পুণ্যলগ্নে আমরা আমাদের বরণীয় সাহিত্য-স্রষ্টাকে শ্রদ্ধা জানাতে চাই তাঁরই সৃষ্ট কয়েকটি স্মরণীয় গল্পকে বাংলায় তর্জমা করে। বর্তমান সংকলনটি আমাদের সেই সীমিত প্রয়াসেরই সশ্রদ্ধ নিবেদন।

## গল্প-সম্পর্কে

জনৈক সমালোচক লিখেছেন, ইতিহাসে সব কিছু বাস্তব হওয়া সত্ত্বেও তা অসত্য ; এবং কথা-সাহিত্যে সব-কিছু কাল্পনিক হওয়া সত্ত্বেও তা সত্য। এই বক্তব্যের এ ছাড়া আর কি বা অর্থ হতে পারে যে ইতিহাসে শুরু থেকে শেষ অবধি হত্যা, সংগ্রাম এবং ছল-কপটতায় ভরা—যা কিনা অসুন্দর, এবং এই কারণে তা অসত্য। লোভের ক্রূরতা চেয়েও ক্রূরতর, লোভের নীচতা থেকেও নীচতর, ঈর্ষার অধম থেকেও অধমতম ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া যায়, তখন ভাবতে হয় মনুষ এতখানি অমানুষ! সামান্য স্বার্থের জন্য ভাই ভাইকে হত্যা করে, পুত্র পিতাকে হত্যা করে এবং রাজা অসংখ্য প্রজাকে হত্যা করে। এ সব পাঠ করার পর মনে গ্লানি জাগে, আনন্দ নয় ; এবং যে বস্তু আনন্দ প্রদান করে না, তা কখনও সুন্দর হতে পারে না ; এবং যা সুন্দর নয়, তা সত্যও হতে পারে না। যেখানে আনন্দ, সেটাই সত্য। সাহিত্য কাল্পনিক ব্যাপার ; কিন্তু তার প্রধান গুণ হলো আনন্দ দান করা এবং এই কারণে তা সত্য।

মনুষ্য এই জগতে যা সত্য এবং সুন্দর পেয়েছে এবং পাচ্ছে, তাকেই সাহিত্য বলে।

মনুষ্য জাতির কাছে মনুষ্যই সর্বাপেক্ষা ধাঁধা স্বরূপ। সে স্বয়ং নিজেকেই বুঝতে পারে না। কোনো না কোনো ভাবে সে নিজেরই সমালোচনা করে—নিজের মনোরহস্য উন্মোচন করে। মানব-সংস্কৃতির বিকাশ এর ফলেই ঘটেছে যে মানুষ নিজেকে বুঝতে পারে। অধ্যাত্মবাদ এবং দর্শনের মত সাহিত্যও এই অন্বেষণে ব্যস্ত ; তফাৎ এই যে সে এই উদ্যোগে রস মিশ্রিত করে তাকে আনন্দপ্রদ করে তোলে ; এই কারণে অধ্যাত্মবাদ এবং দর্শন কেবল জ্ঞানীদের জন্য ; কিন্তু সাহিত্য মনুষ্য-মাত্রের।

গল্প বা আখ্যায়িকা, সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। আজ নয়, আদিকাল থেকেই। তবে, বর্তমান কালের আখ্যায়িকা এবং প্রাচীন কালের আখ্যায়িকায়, সময়ের গতি ও রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন আখ্যায়িকা হয় কৌতূহল-প্রধান নয় আধ্যাত্মিক হত। উপনিষদ এবং মহাভারতে আধ্যাত্মিক রহস্য বোঝানোর জন্য আখ্যায়িকার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। বৌদ্ধ-জাতক আখ্যায়িকা ছাড়া আর কি ? বাইবেলেও দৃষ্টান্ত ও আখ্যায়িকার মাধ্যমে ধর্মের তত্ত্ব বোঝানো হয়েছে। সত্য এ ভাবেই এসে সাকার রূপ নেয়, তখন লোকেরা বুঝতে পারে, এবং তার ব্যবহার করে।

বর্তমান কালের আখ্যায়িকা মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং জীবনের বাস্তব ও স্বাভাবিক চিত্রণকে নিজের উদ্দেশ্য মনে করে। তাতে কল্পনার মাত্রা কম এবং অনুভূতির মাত্রা বেশী। কেবল তাই নয়, বরং অনুভূতিই সৃষ্টিশীল ভাবনায় অনুরঞ্জিত হয়ে কাহিনী হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু এই ধারণা ভুল যে, কাহিনী জীবনের যথার্থ প্রতিচ্ছবি। যথার্থ জীবনের ছবি মানুষ স্বয়ং হতে পারে, কিন্তু কাহিনীর চরিত্রের সুখ-দুঃখে আমরা যতখানি প্রভাবিত হই, ততখানি প্রভাবিত যথার্থ জীবনে হই না—যতক্ষণ না তা নিজস্বের পরিধিতে আসে। কাহিনীর চরিত্রদের সঙ্গ দু-এক মিনিটের পরিচয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে, এবং আমরা তাদের সঙ্গে হাসতে থাকি, কাঁদতে থাকি। তাদের হর্ষ ও বিষাদ আমার নিজের হর্ষ ও বিষাদে পরিণত হয়; কেবল এটাই নয়, বরং কাহিনী পাঠে সে ধরনের পাঠককে হাসতে ও কাঁদতে দেখা যায়, যাদের ওপর সাধারণতঃ সুখ-দুঃখের কোন প্রভাব পড়ে না। শ্মশানে বা কবরখানায়ও যাদের চোখ সজল হয় না, তারাও উপন্যাসের মর্মস্পর্শী স্থলে পৌছে কাঁদতে থাকে।

সম্ভবতঃ এর কারণ হতে পারে, স্থুল প্রাণী সূক্ষ্ম মনের ততটা কাছাকাছি পৌছতে পারে না, যতটা পারে কাহিনীর সূক্ষ্ম চরিত্র। কাহিনীর চরিত্র ও মনের মাঝে জড়তার তেমন কোন আড়াল থাকে না, যা এক মানুষের হৃদয়কে অন্য মানুষের হৃদয় থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। তাছাড়া, যদি আমরা যথার্থের হু-ব-হু ছবি এঁকে দিই, তাতে শিল্প কোথায়! শিল্প কেবল যথার্থের নকল করার নাম নয়। শিল্প যদিও দেখতে যথার্থ; কিন্তু তা মোটেই যথার্থ নয়। তার বিশেষত্ব এই বে, সে যথার্থ না হয়েও যথার্থ মনে হয়। তার মাপ-দণ্ড জীবনেয় মাপ-দণ্ড থেকে পৃথক। জীবনে অধিকাংশ আমাদের সমাপ্তি তখন ঘটে, যা অনেক 'সময় বাঞ্ছনীয় নয়। জীবন কারো স্থায়ী নয়; তার সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি জীবন-মরণে কোন ক্রম, কোন সম্পর্ক তার জ্ঞাত হয় না। অন্ততঃ মনুষ্যের কাছে তা অজ্ঞেয়। কিন্তু কথা-সাহিত্য মনুষ্য-রচিত জগৎ, এবং তা পরিমিত হওয়ার ফলে সম্পূর্ণ-ভাবে আমাদের সামনে হাজির হয়। যেখানে আমাদের মানবীয় ন্যায়-বুদ্ধি বা অনুভূতির অতিক্রমণ করতে দেখা যায়, সেখানে আমরা তাকে সাজা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়ি। কাহিনীতে যদি কেউ সুখ পায়, তার কারণ বার করতে হবে, দুঃখও যদি পায়, তার কারণও বার করতে হবে। এখানে কোন চরিত্রের মৃত্যু নেই, যদি না মানব-ন্যায়বুদ্ধি তার মৃত্যু কামনা করে। স্রষ্টাকে পাঠকের আদালতে তার প্রতিটি কৃতির জন্য জবাবদিহি করতে হয়। শিল্পের রহস্য ভ্রান্তি; তবে সেই ভ্রান্তি, যার ওপর যথার্থের আবরণ থাকে।

—প্রেমচন্দ

# সততার সাজা

সাধারণ মানুষের মত সাজাহানপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার সর্দার শিবসিংহের মাঝে ভাল ও মন্দ দুটো গুণই ছিল। ভাল এই কারণে যে তাঁর কাছে ন্যায় ও দয়ার কোন পার্থক্য ছিল না। মন্দ এই কারণে তিনি সম্পূর্ণ নির্লোভ ও নিঃস্বার্থ ছিলেন। ভাল গুণের ফলে অধস্তন কর্মচারীরা নির্ভীক ও অলস হয়ে পড়েছিল, মন্দ গুণের ফলে তাঁর বিভাগের প্রতিটি কর্মচারী তার পরম শত্রু হয়ে উঠেছিল।

সকাল বেলা। একটি ব্রীজ ইন্সপেকশনে যাবে বলে তিনি তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অথচ, তার শহিস তখনও সুখ নিদ্রায় মগ্ন। গতরাতে তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, অন্ধকারে ডুবে যাওয়ার আগেই যেন গাড়ী তৈরী থাকে। কিন্তু, ভোর হল, সূর্যের দেখা মিলল, স্নিগ্ধ সূর্যরশ্মিতে উষ্ণতা এল, অথচ সহিসের ঘুম তখনও ভাঙ্গে নি।

সর্দার সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়েন। সহিস অবশ্য জেগে ওঠে কোন রকম, কিন্তু আর্দালির পাত্তা নেই। ওদিকে যে লোকটি ডাক আনতে গিয়েছিল, সে তখন একটি মন্দিরের দ্বারে দাঁড়িয়ে চরণামৃত পরীক্ষা করতে ব্যস্ত। ঠিকেদারকে ডাকার জন্য যে-জন গিয়েছিল, সে এখন রামদাস বাবাজীর সেবায় বসে গাঁজায় দম দিচ্ছে।

রোদ তীব্র হয়ে উঠেছে। বিরক্ত হয়ে সর্দার সাহেব বাড়ীর ভেতরে চলে যান, বৌকে বলেন—এতখানি বেলা হলো, এখনও একটা চাপরাসির দেখা নেই। এদের জ্বালায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে।

বৌ দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেয়ালকেই বলে, ওদের মাথায় তোলার ফলেই এইসব হয়েছে।

সর্দার সাহেব রেগে বলে ওঠেন, তাহলে কি করবো বল? ওদের কি ফাঁসিতে ঝোলাবো?

॥ ২ ॥

মোটর-কার দূরের কথা, সর্দার সাহেবের কাছে কোনও ফিটনও ছিল না। তিনি তাঁর এক্কাগাড়ী নিয়েই খুশী, চাকর-বাকরেরা এই এক্কাগাড়ীকে নিজস্ব ভাষায় 'উড়ন্ত খাট' বলে ডাকে। অবশ্য শহরের অধিবাসীরা এহেন সম্মানজনক নাম না-দিয়ে সেটাকে 'ছ্যাকরা গাড়ী' বলাটাই সমীচিন মনে করে। সর্দার সাহেব অন্যান্য ব্যাপারেও এই রকম মিতব্যয়ী ছিলেন। দুই ভাইকে এলাহাবাদে রেখে পড়ান। বিধবা মা বেনারসে থাকেন। একটি বিধবা বোন তাঁর আশ্রিত। এ ছাড়া কয়েকজন দরিদ্র ছেলেদের তিনি ছাত্রবৃত্তি দিতেন। এইসব কারণে তিনি প্রায় শূন্য হাতেই থাকতেন। এমন কি তাঁর পোষাক-আশাকেও আর্থিক দূরবস্থার চিহ্ন ফুটে উঠতো। তবুও এত সব কষ্ট সহ্য করেও লোভকে ধারে কাছে ঘেঁষতে দিতেন না। যাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা আছে, তারা তাঁর সততার প্রশংসা করে এবং তাঁকে দেবতা মনে করে। তাঁর ভদ্রতায় কোন ক্ষতি সৃষ্টি হয় না; কিন্তু যাদের সঙ্গে তার ব্যবসায়িক সম্পর্ক, তারা তাঁর এই সংভাবের প্রশংসক নয়, কারণ তার ব্যবহারে তাদের বরং ক্ষতিই হয়। মাঝে মাঝে এই কারণে তাঁকে সহধর্মিনীর কাছ থেকেও অপ্রিয় কথা শুনতে হয়।

একদিন অফিস থেকে ফিরে আসার পর, স্ত্রী প্রীতিপূর্ণ কণ্ঠে বলে, আচ্ছা তোমার এই সততাবোধের লাভটা কি বলতে পারো, গোটা সংসার তোমাকে মন্দ বলে উপহাস করে।

সর্দার সাহেব দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দেন, সংসার যাই বলুক না কেন, ঈশ্বর দেখছেন।

রমা এর উত্তর পূর্বাহ্ণেই ভেবে রেখেছিল। বলে ওঠে, তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করছি না, কিন্তু একবার ভালো করে ভেবে-চিন্তে দেখো তোমার এই সততায় অপরের পক্ষে কি ঘটে? তুমি ভালো মাইনে পাও। সুতরাং হাত না-পাতলেও তোমার চলে যাবে। শুকনো রুটি জুটবেই। কিন্তু এই যে চাপরাসি, মুহুরি, দপ্তরি—দশ টাকা পাঁচ টাকা পায়—বেচারীরা কি করে চালায়। তাদেরও তো ছেলে-পুলে আছে। তাদেরও আত্মীয়-কুটুম আছে। বিয়ে-শ্রাদ্ধ, পালা পার্বণ তাদেরও করতে হয়। ভালমানুষের বেশ ধরে থাকলে কাজ চলে না। বলো, তাদের সংসার চলে কি করে? এইতো রামদীন চাপরাসীর বৌ এসেছিল, কেঁদে-কেটে আঁচল ভিজিয়ে ফেলল। মেয়ে বড় হয়েছে। এখন বিয়ে দেয়া দরকার। জাতে বামুন—কত খরচ। বলো, তার চোখের জল কার মাথায় ঝরবে?

কথাগুলি সবই সত্য। সর্দার সাহেবের এ ব্যাপারে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। তিনি নিজেই এ বিষয়ে অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করেছেন। এই কারণেই, অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে তিনি খুব কোমল ব্যবহার করতেন। কিন্তু সরলতা বা শালীনতার আত্মিক গৌরব যাই হোক না কেন, আর্থিক মূল্য তার খুবই কম। তিনি বললেন, তোমার সব কথাই বাস্তব, আমি স্বীকার করি; কিন্তু এ ব্যাপারে আমি অপারগ। নিজের নিয়ম ভাঙ্গি কি করে? যদি আমার সাধ্য থাকতো, তাহলে ওদের মাইনে বাড়িয়ে দিতাম। তা বলে আমার পক্ষে এ কখনও সম্ভব নয় যে নিজে চুরিচামারি করি, ওদের কেও চুরিচামারি করতে দিই।

রমা ব্যঙ্গস্বরে বলে ওঠে, তাহলে এইসব অভিসম্পাত কার মাথায় ঝরবে?

সর্দার সাহেব উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, জবাব দেন—কার আবার?

ওদের মাথায় পড়া উচিৎ যারা নিজের সামর্থ্য ও আয়ের চেয়ে বেশী ব্যয় করতে চায়। আর্দালি হয়ে উকিলের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ পাতানোর দরকার কি? দফতরির যদি খিদমৎগারের প্রয়োজন পড়ে, জেনো, তা কোন পাপ কর্মের চেয়ে কম নয়। এখন যদি সহিসের বৌ রূপোর নেকলেস গলায় জড়াতে চায়, তাহলে সেটা হবে তার বোকামি। এই সব মিথ্যে অহমিকার প্রশয় আমি কোনমতে দিতে পারি না।

॥ ৩ ॥

ইনজিনিয়ারদের সঙ্গে ঠিকেদারদের সঁম্পর্ক কিছুটা মৌমাছি ও ফুলের মত। যদি তারা নিজেদের নির্দিষ্ট অংশ থেকে অতিরিক্ত পাবার চেষ্টা না করে, তাহলে কারো প্রতি তাদের কোন অভিযোগ থাকতে পারে না। এই মধু-রসকে কমিশন বলা হয়। ঘুষ মানুষের ইহলোক ও পরলোক দুটোরই সর্বনাশ করে। তাতে ভয় আছে, চুরি আছে, বদমাইশি আছে। কিন্তু কমিশন একটি মনোহর বটিকা—সেখানে মানুষের কেবল ভয় নেই, পরমাত্মার ভয় নেই, এমন কি আত্মার গোপন মোচড়ের কোন অবকাশ নেই। কেবল তাই নয়, এর প্রতি কেউ দুর্ণামের চোখও তুলতে পারে না। এটা এমন এক ধরণের বলিদান, যা হত্যা হওয়া স্বত্বেও ধর্মের অঙ্গ হয়ে ওঠে। এমত অবস্থায় সর্দার শিবসিংহ যদি তাঁর উজ্জ্বল চরিত্র এই কালো দাগ থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন, এবং এ সম্পর্কে অভিমান করেন—তাহলে তিনি ক্ষমার পাত্র ছিলেন।

মার্চমাস অতিক্রম করেছে। চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার জেলা সফরে আসছেন। কিন্তু কনস্ট্রাকশানের কাজ আজও অসম্পূর্ণ। রাস্তা-ঘাট খারাপ হয়ে পড়েছে, অথচ ঠিকেদাররা মাটি ও খোয়া এখনও জড়ো করেনি।

সর্দার সাহেব রোজ ঠিকেদারদের তাগাদা দিতেন, কিন্তু তার কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

একদিন তিনি সকলকে ডেকে পাঠান। বলেন, আপনারা কি চান আমি এ জেলা থেকে অপযশ কুড়িয়ে চলে যাই। আপনাদের সঙ্গে এ যাবৎ কোন দুর্ব্যবহার করিনি। ইচ্ছে করলে আপনাদের কাছ থেকে কাজ কেড়ে নিয়ে নিজেই করিয়ে নিতাম, কিন্তু আপনাদের ক্ষতি করাটা আমি উচিৎ মনে করি না। তার ফলেই আজ আমার এই ভোগান্তি। যাই হোক!

ঠিকেদাররা সেখান থেকে যাবার পথে আলোচনা শুরু করে। মিঃ গোপাল দাস বলে, এবার টের পাবেন কত ধানে কত চাল।

শাহবাজ খান বলে, কোন রকমে এঁর বদলি হোক এখান থেকে…

সেঠ চুনীলাল জানায়, ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, আমি তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। দেখবেন, এঁকে কেমন দড়ি ধরে ঘোরায়।

একথা শুনে বুড়ো হরিদাস উপদেশ দেয়, বুঝলে নেহাৎ আমাদের স্বার্থের ব্যাপার। নইলে, সত্যি কথা বলতে কি ইনি মানুষ নন—দেবতা। কিছু না করলেও এক বছরে কমিশন হিসেবে দশহাজার টাকা তুলতে পারতেন। এতগুলি টাকাকে মাটির ডেলার মত তুচ্ছ ভাবাটাও কি সহজ কথা? অথচ আমাদের দেখো, পয়সার জন্য ধর্ম বিক্রী করে চলেছি। যে সৎপুরুষ আমাদের সঙ্গে এক পয়সারও রফা করেন না, সব রকম কষ্ট স্বীকার করেও যাঁর পথভ্রষ্ট হয় না, তাঁর সঙ্গে এমন নীচ ও কুটিল ব্যবহার করতে হচ্ছে। নিজেদের দূর্ভাগ্য ছাড়া আর কি ভাবা চলে, বলো।

শাহবাজ খান জানায়—তাতো বটে; এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে ইনি দয়ার অবতার।

সেঠ চুনীলাল গম্ভীর স্বরে বলে, খাঁ সাহেব! আপনি যা বললেন

যথার্থই তা। কিন্তু, কি করা যায় বলুন? দয়া-ভদ্রতা দিয়ে তো আর ব্যবসা চলে না। দুনিয়াটাই হলো ছল-চাতুরিময়।

মিঃ গোপাল দাস বি. এ. পাশ। তিনি গর্বভরে বলে ওঠে, এভাবেই যদি তাঁর থাকার কথা, তাহলে চাকরীর দরকার কিসের? সকলেই জানে নিজের ধর্ম পরিষ্কার রাখা ভাল ব্যাপার। কিন্তু সেই সঙ্গে এও দেখা দরকার, এতে অপরের ওপর কি ধরণের প্রভাব পড়ে? আমাদের এমন লোক চাই, যে নিজেও খাবে—আমাদেরকেও খাওয়াবে। নিজে হালুয়া খাক, কিন্তু আমাদের অন্ততঃ রুটি খাওয়াক। সে যদি এক টাকা কমিশন খায়, তার পরিবর্তে আমাদের পাঁচ টাকা লাভ তুলে দিক। এঁর দ্বারা আমাদের হবেই বা কি? আপনারা যাই বলুন না কেন, এঁর সঙ্গে আমার কখনও বনিবনা হবে না।

শাহবাজ খান বলে, নম্রতা সততা থাকা নিঃসন্দেহে ভাল, কিন্তু এমন শততায় কি লাভ যা অপরের ক্ষতি করে।

বুড়ো হরিদাসের কথায় যারা সমর্থন করেছিল, তারা সকলেই গোপাল দাসের কথায় মেতে ওঠে। দুর্বল আত্মায় সততার প্রকাশ জোনাকীর আলোর মত।

## ।৪।

সর্দার সাহেবের একটি মেয়ে। মীরাটের জনৈক উকিলের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে স্থির হয়েছে। ছেলেটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। বংশ মর্যাদায় উঁচু। সর্দার সাহেব বেশ কয়েক মাস দৌড়-ঝাঁপ করে এই বিয়ের সম্পর্ক স্থির করেন। অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপারে কথাবর্তা হয়ে গেছে, কেবল বরপণের বিষয়টি এখনও চুড়ান্ত স্থির হয়নি। আজ উকিলবাবুর চিঠি এসেছে। উনি এ বিষয়টি নিশ্চিত করে দিয়েছেন; কিন্তু বিশ্বাস, আশা এবং পাকা কথার একেবারেই

বিপরীত। প্রথমেই উকিলবাবু একজন জেলা ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক গড়াটাই বৃথা মনে করেছিল। বলা চলে, খুবই ছুটকো উদারতা দেখিয়েছিল। এই ধরণের লজ্জাজনক ও ঘৃণিত ব্যবহারে তার কান্না পেয়েছিল। তারপর, আরও বেশী খোঁজ-খবর নেয়ার ফলে সর্দার সাহেবের ধন-বৈভবের রহস্য উন্মোচীত হতে বর-পনের নিষ্পত্তি করাটা জরুরী হয়ে দাড়ায়। সর্দার সাহেব শঙ্কিত হাতে চিঠি খোলেন, পাঁচ হাজারের কমে এই বিয়ে সম্ভব নয়। উকিলবাবুর বাস্তবিক ভয়ানক লজ্জা ও গভীর পরিতাপ জাগছে, এবং তাঁকে এ ব্যাপারটা খোলাখুলিভাবে জানানো দরকার হয়ে পড়ে। আসলে তার বংশের কয়েকজন বৃদ্ধ, অভিজ্ঞ, বিচারহীন, স্বার্থান্ধ মহাত্মার হাতে তিনি বড় তিক্ত বিরক্ত। বস্তুতঃ তার নিজের কোন বশ ছিল না। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। তাঁর সমস্ত আশা-কল্পনা মাটিতে মিশে যায়। কি ভেবেছিলেন, কি হলো। হতাশ হয়ে ঘরে পায়চারি করতে থাকেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি চিঠিটা তুলে নেন, তারপর ভেতরে যান। ভাবেন, এই চিঠিটা রমাকে পড়ে শোনাবেন, কিন্তু খেয়াল হয় তার কাছে সহানুভূতি পাবার কোন আশা নেই। কেন মিছিমিছি নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করবেন? কেন মূর্খ হবেন? রাগারাগি করা ছাড়া স্ত্রী কোন কথাই বলবেন না। এই সব ভেবে অবশেষে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন।

সর্দার সাহেব স্বভাবে দয়ালু ছিলেন, এবং কোমল হৃদয়বান লোকেরা বিপদে-আপদে স্থির অবিচলিত থাকতে পারে না। দুঃখে ও গ্লানিতে ডুবে গিয়ে তিনি ভাবছিলেন, আমি এমন কি অপকর্ম করেছি যার ফলভোগ আমাকে পেতে হলো। কয়েক বছর দৌড়-ঝাপ করে যে কার্য সিদ্ধি হয়েছে, মুহূর্তে তা নষ্ট হয়ে গেল। এখন অবস্থা আমার সামর্থের বাইরে। কোন মতেই নিজেকে আমি আর সামলাতে পারবো না। চারদিকে কেবল অন্ধকার। কোথাও

আশার আলো নেই। কেউ আমার সহযোগীও নয়। তাঁর চোখ-জোড়া সজল হয়ে ওঠে।

সামনে টেবিলের ওপর ঠিকেদারদের বিল পড়ে আছে, কয়েক সপ্তাহ ধরে এমনি পড়ে আছে। সর্দার সেসব খুলেও দেখেন নি। আজ এই আত্মগ্লানি এবং নৈরাশ্যজনক অবস্থায় তিনি সতৃষ্ণ নয়নে বিলগুলির দিকে চেয়ে দেখতে থাকেন। সামান্যতম ইঙ্গিতে তাঁর যাবতীয় অসুবিধে দূর হতে পারে। চাপরাসি, ক্লার্ক শুধুমাত্র আমার সম্মতিতে সব কিছু ঠিক-ঠাক করে ফেলবে। আমার জিভটুকু নড়ানোর প্রয়োজন পড়বে না। এমন কি আমায় অপ্রস্তুত হতে হবে না। এই সব ভাবনা এত বেশী প্রবল হয়ে ওঠে যে বস্তুতঃ তিনি বিলগুলি তুলে নিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করতে থাকেন এবং মনে মনে হিসেব কসতে থাকেন—এ থেকে কত আদায় করা যেতে পারে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আত্মা তাঁকে ঝাকুনি দিয়ে জাগিয়ে তোলে—আহ! আমি কোন ভ্রমে পড়ে আছি? সেই আত্মিক পবিত্রতা, যা আমার আজন্ম উপার্জিত, কেবলমাত্র সামান্য অর্থের জন্য সমর্পণ করবো? সে কারণে সহকর্মী-কর্মচারীদের সামনে গর্বভরে মাথা উঁচু রেখে হেঁটে বেড়াই, সে কারণে মোটর গাড়ীঅলা পরিচিত-জনেরা আমার চোখে-চোখ রাখতে পারে না, সেই আমি কিনা আজ সেই সব গৌরব ও সম্মান—নিজের সম্পূর্ণ আত্মিক সম্পত্তি—কেবল মাত্র দশ-পাঁচ হাজারে খুইয়ে দেবো? না, এমন কখনও হতে পারে না।

যে কু-ভাবনা কিছুক্ষণ আগে তার ওপর চেপে বসেছিল, তাকে সরিয়ে ফেলার জন্য, তিনি নির্জন ঘরে সশব্দে হেসে ওঠেন। এই হাসি ঐসব বিল বা ঘরের দেয়াল নাইবা শুনে থাক, কিন্তু তাঁর আত্মা যে শুনেছে এবিষয়ে নিশ্চিত। আত্মার এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় তিনি পরম আনন্দ লাভ করেন।

সর্দার সাহেব ঐ-সব বিল তুলে টেবিলের নীচে ফেলে দেন।

তারপর পদদলিত করেন। লোভ জয় করার আনন্দে হাসতে হাসতে ভেতরে যান।

॥ ৫ ॥

চীফ ইঞ্জিনিয়ার নির্দিষ্ট সময়ে শাহজাহানপুরে আসেন। সঙ্গে সর্দার সাহেবের দুর্ভাগ্যও আসে। জেলার সমস্ত কাজকর্ম অর্দ্ধ সমাপ্ত পড়ে আছে। খানসামা বলে, হুজুর! কাজ শেষ হবে কি করে? সর্দার সাহেব ঠিকেদারদের বড্ড বিরক্ত করেন। হেডক্লার্ক দপ্তরের হিসেবে ভূল-ভ্রান্তি দেখতে পায়। সর্দার সাহেবের কাছ থেকে তাকে কোন নিমন্ত্রণ বা ভেট দেয়া হয় নি। সর্দার সাহেব তো তার আত্মীয় নন যে সে ভুল খুঁজে বার করবে না?

জেলার ঠিকেদাররা একটি বহুমূল্য ডালি সাজায়, এবং তা চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সেবায় নিয়ে হাজির হয়। তারা বলে, হুজুর! গোলামদের বধ করতে হয় করুন, কিন্তু সর্দার সাহেবের অন্যায় আর সহ্য করা যায় না। কমিশন নেন না বটে, কিন্তু এদিকে যে আমাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ইন্সপেকশন বুকে লেখেন, 'সর্দার শিবসিংহ অসাধারণ সৎ লোক। তাঁর চরিত্র উজ্জ্বল, কিন্তু তিনি এত বড় জেলার দায়িত্ব সামলাতে পারেন না।'

পরিণামে, তাঁকে একটি ছোট জেলায় পাঠিয়ে দেয়া হয়, সেই সঙ্গে তার পদমর্যাদাও হ্রাস পায়।

সর্দার সাহেবের বন্ধু ও প্রিয়জনেরা বেশ সমারোহ সহকারে একটা পার্টির আয়োজন করে। তাতে তার ধর্মনিষ্ঠা ও স্বাধীন মনোভাবের প্রশংসা করা হয়। সভাপতি সজল নেত্রে কম্পিত স্বরে বলেন, সর্দার সাহেবের বিদায়ের দুঃখ আমাদের প্রাণে সর্বদা বাজতে থাকবে। এই শূন্যতা কখনও পূরণ হবে না।'

'ফেয়ারওয়েল ডিনারে' এ ব্যাপরটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে সুস্বাদু ভোজনের সামনে বিদায়ের দুঃখ মোটেই দুঃসহ নয়।

যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ তৈরী। সর্দার সাহেব পার্টি থেকে ফিরে এলে রমা তাঁর উদাস ও মলিন মুখ দেখতে পায়। সে বার বার বলেছিল, বড় ইঞ্জিনীয়ারের খানসামাকে বকশিশ দাও, হেড ক্লার্ককে নেমন্তন্ন করো; কিন্তু সর্দার সাহেব তার কথা রাখেন নি। যখন শোনে, তাঁর পদমর্যাদা কমিয়ে দিয়েছে এবং বদলিও করে দিয়েছে, রমা তখন নির্মমভাবে তাঁকে ব্যঙ্গ করে। কিন্তু, এই মুহূর্তে তাকে উদাস দেখে আর স্থির থাকতে পারে না। জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার, এত বিষণ্ন কেন? সর্দার সাহেব উওর দেন কি করবো, হাসবো? রমা এবার গভীর স্বরে বলে ওঠে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হাসা উচিত। তাদেরই কাঁদা উচিত যারা সামান্য মুদ্রার বিনিময়ে নিজের আত্মা ভ্রষ্ট করে—যারা টাকার জন্য ধর্ম বিক্রী করে। এ তো আর অসততার সাজা নয়। এ হোল সততা ও ন্যায়ের সাজা। সহাস্যে এর মোকাবিলা করা উচিত।

এই বলে সে স্বামীর দিকে তাকায়। তার দৃষ্টিতে অকৃত্রিম অনুরাগ ফুটে ওঠে। সর্দার সাহেব তার দিকে প্রীতিময় দৃষ্টিতে দেখে। তাঁর হৃদয়েশ্বরীর মুখশ্রী অকৃত্রিম আনন্দে বিকশিত। তাকে বাহুবন্দী করে বলে ওঠেন, রমা। তোমার সহানুভূতিরই প্রয়োজন ছিল আমার। এখন আমি সহাস্যে এই সাজা গ্রহণ করবো।

———

# মিছিল

পূর্ণ স্বরাজ্যের মিছিল বেরিয়েছে। কয়েকজন যুবক, প্রৌঢ় এবং বালক নিশান ও পতাকা নিয়ে বন্দেমাতরম গাইতে গাইতে বাজারের সামনে এগিয়ে যায়। দু-দিকে দর্শকের প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে, যেন এই সমাবেশে তাদের কোন সম্পর্ক নেই; এটা একটা তামাশা এবং তাদের কাজ হলো কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা।

শম্ভুনাথ দোকানের রকে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশী দীনদয়ালকে বলে—সবকটা মরণের মুখে এগিয়ে চলেছে। সামনেই ঘোড়সওয়ারের দল আছে, মেরে সবকটাকে ভাগিয়ে দেবে।

দীনদয়াল বলে—মহাত্মাজীও বুদ্ধিভ্রমে পড়েছেন। মিছিল বার করলেই যদি স্বরাজ্য পাওয়া যেত, তাহলে এতদিনে পেয়ে যেতেন। তাছাড়া মিছিলে কারা-কারা আছে দেখ, যত্তোসব ছোকরা, ফিচেল, বাউণ্ডুলে। শহরের কোন বড় লোক নেই।

ম্যাকু চপ্পল ও জুতোর মালা গলায় ঝুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই দুজন মহাজনের কথা শুনে হেসে ফেলে।

শম্ভু জিজ্ঞেস করে—হাসলি কেনরে ম্যাকু? আজ রং যেন বেশ চড়া দেখছি।

ম্যাকু—হাসি পেল আপনাদের কথা শুনে! বললেন না কোন বড় লোক মিছিলে নেই! তা, বড়লোকেরা মিছিলে আসবে কেন? এই শাসনে তাদের কিসে আরাম নেই? বাংলোয়—প্রাসাদে বাস করছে, মোটর গাড়ীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সাহেবদের সঙ্গে নেমতন্ন খাচ্ছে—মরছি আমাদের মত লোকেরা যাদের রুটির ঠিক-ঠিকানা নেই। গিয়ে দেখ, এখন তারা কেউ টেনিস খেলছে, কেউ বা হয়তো চা খাচ্ছে, কেউ বা গ্রামোফোনে গান শুনছে, কেউ পার্কে ভ্রমণ

করছে, পুলিশের চাবুক খেতে তারা এখানে আসবে কেন? বেশ বললেন যা হোক!

শম্ভূ—তুমি এসব কথা কতটুকু আর বোঝ ম্যাকু, কোন কাজের জন্য যদি চারজন বড় লোক এগিয়ে আসে, সরকারের ওপরও ভাল-ভাবে চাপ পড়ে। ছেলে-ছোকরার ভিড় হাকিমদের চোখে কতটা গুরুত্ব পাবে?

ম্যাকু এমন এক দৃষ্টিতে দেখে, যেন বলতে চায়—এইসব কথা বোঝানোর ভার তুমিই নিয়েছো নাকি, তারপর বলে ওঠে—বড়-লোকদের আমরাই গড়ি, আমরাই নষ্ট করি, নাকি অন্য কেউ? এমন কত লোক আছে যাদের কেউ জিজ্ঞেসও করতো না, আমাদেরই গড়া বড়লোক হয়ে পড়েছে, এখন তারা মোটরে চেপে ঘুরে বেড়ায় আর আমাদের নীচু ভাবে। ভাগ্যবলে যারা একটু বড় হয়েছে, অমনি তারা আমাদের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছে। আমাদের কাছে বড়লোক সে-ই, যে লেংটি বেঁধে খালি পায়ে ঘুরে বেড়ায়, যে আমাদের অবস্থা ফেরাবার জন্য নিজের প্রাণ হাতে নিয়ে ঘোরে। এ ছাড়া অন্য কোন লোকের পরোয়া আমরা করি না। সত্যি কথা বলতে কি, এইসব বড়লোকেরাই আমাদের মাটি দূষিত করে দিয়েছে। সরকার এদের ভালো একটা আসন দিয়েছে, এখন সেটাই সামলে চলেছে।

দীনদয়াল—নতুন দারোগাবাবু একটা জল্লাদ গোছের। চৌরাস্তায় পৌঁছলেই হাণ্টার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারপর দেখবে, সবকটা কেমন লেজ তুলে পালায়। মজা শুরু হবে তখন।

স্বাধীনতার নেশায় মগ্ন মিছিল চৌরাস্তায় গিয়ে পড়ে, দেখে, সম্মুখে ঘোড়সওয়ার এবং সেপাইদের একটি বাহিনী পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে।

দারোগা বীরবল সিংহ ঘোড়ায় করে গিয়ে সহসা মিছিলের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়, বলে—তোমাদের এগিয়ে যাওয়ার হুকুম নেই।

মিছিলের বৃদ্ধ নেতা ইব্রাহিম আলী এগিয়ে গিয়ে বলেন আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, কোন ধরণের দাঙ্গা-ফ্যাসাদ হবে না, দোকান লুঠ করতে বা মোটর ভাঙ্গতে আমরা বেরোই নি। আমাদের উদ্দেশ্য এর চেয়ে অনেক উর্ধে।

বীরবল—আমায় হুকুম দেয়া হয়েছে মিছিল এর চেয়ে এগিয়ে যেন না যায়।

ইব্রাহিম—আপনি একবার আপনার অফিসারকে জিজ্ঞেস করে নিন।

বীরবল—এর কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

ইব্রাহিম—তাহলে আমরা সকলে এখানে বসছি। আপনারা যখন চলে যাবেন, তখন আমরা যাবো।

বীরবল—এখানে অপেক্ষা করার হুকুম নেই। তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

ইব্রাহিম গম্ভীর স্বরে বলেন—ফিরে আমরা যাবো না। আপনার বা কারোর কোন অধিকার নেই আমাদের বাধা দেয়ার। আপনি ঘোড়সওয়ার, সঙ্গিন, ও বন্দুকের জোরে আমাদের আটকাতে চান—আটকান; কিন্তু আপনি আমাদের ফেরৎ পাঠাতে পারেন না। কে জানে কবে এমন দিন আসবে, যেদিন আমাদের ভাই-বেরাদর এমন হুকুম তামিল করতে স্পষ্ট প্রতিবাদ করবে, যাদের উদ্দেশ্য দেশের গোলামির ছেকলে জড়িয়ে থাকা।

বীরবল গ্রাজুয়েট ছেলে। তার পিতা সুপারিণ্টেনডেণ্ট-অব পুলিশ ছিলেন। শিরা-উপশিরায় পিতার রোয়াব প্রবাহিত। অফিসারদের দৃষ্টিতে তার সম্মানও উচ্চ। উজ্জ্বল ফর্সা ত্বক, নীল চোখ এবং কটা চুলে তেজস্বী পুরুষ। যখন সে কোট গায়ে মাথায় হ্যাট চাপায়, তখন ভুলে যায়, আমি এখানকার বাসিন্দা। সম্ভবতঃ সে নিজের শাসন কর্তাদের জাতের অঙ্গ মনে করে; কিন্তু ইব্রাহিমের কথায় যে তিরস্কার ছিল, কিছুক্ষণের জন্য তাকে লজ্জায় ফেলে দেয়;

অথচ পরিস্থিতি বড়ই সংকটময়। মিছিলকে যদি পথ করে দেয়, তাহলে কৈফিয়ৎ তলব হতে পারে; আর যদি সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেয়, কে জানে তাহলে কতক্ষণ এঁরা দাঁড়িয়ে থাকবে; এই সংকটে যখন সে ব্যস্ত, ডি. এম. পি. কে এমন সময় ঘোড়ার ওপর চেপে আসতে দেখা যায়। এখন আর ভাবনা-চিন্তার সময় নয়। এই তো সুযোগ তার কর্মদক্ষতা দেখানোর। সঙ্গে সঙ্গে সে কোমর থেকে বেটন বার করে, তারপর ঘোড়ার লাগাম টেনে মিছিলে ঝাঁপ দেয়। তাকে দেখে অন্যান্য সওয়ারেরা মিছিলের ওপর ঘোড়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইব্রাহিম দাঁড়িয়ে ছিলেন দারোগার ঘোড়ার সামনে। তার মাথার ওপর বেটনের শক্ত আঘাত পড়তেই চোখে অন্ধকার নেমে আসে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে মাথা চেপে বসে পড়ে। সেই সময় দারোগার ঘোড়ার পা জোড়া ওপরে তোলে, পর মুহূর্তে দেখা যায় মাটির ওপর বসে থাকা ইব্রাহিম ঘোড়ার ক্ষুরের তলায় এসে পড়েছে। মিছিল এতক্ষণ শান্ত ছিল। ইব্রাহিমকে পড়তে দেখে কয়েকজন তাকে তোলার জন্য ছুটে যায়; কিন্তু তারা আর এগোতে পারে না। ওদিকে ঘোড়সওয়ারদের লাঠি নির্দয়ভাবে পড়তে থাকে। লোকেরা হাত তুলে লাঠি প্রতিহত করতে থাকে, এবং অবিচলিত দাঁড়িয়ে থাকে। হিংসার স্রোতে প্রবাহিত না হওয়া তাদের পক্ষে প্রতিমুহূর্তে কঠিন হয়ে ওঠে। আঘাত ও অপমান যখন সহ্য করতে হচ্ছে, তাহলে এই প্রাচীর ভেঙ্গে অতিক্রম করার চেষ্টা করবে না কেন? লোকেরা টের পায়, শহরের অসংখ্য জনসাধারণের দৃষ্টি তাদের দিকে নিবদ্ধ। এখান থেকে যদি পতাকা নিয়ে ফিরে যায়, তাহলে কোন মুখে আর স্বাধীনতার নাম উচ্চারণ করবে; কিন্তু প্রাণ রক্ষার জন্য কাউকে পালাতে দেখা যায় না। মিছিলে উদর-ভক্ত বা ভাড়াটে দালালদের কোন দল ছিল না। এটা ছিল স্বাধীনতার প্রকৃত স্বেচ্ছাসেবক, স্বাধীনতা প্রেমিকদের নিয়ে সংগঠিত দল—নিজের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

অনেকের মাথা বেয়ে তখনও রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, অনেকের হাত জখম হয়েছে। শুধু মাত্র একটি আওয়াজেই তারা সকলেই ঘোড়সওয়ারদের সারি ছিড়ে ফেলতে পারতো ; কিন্তু পায়ে বেড়ি বাধা ছিল সিদ্ধান্তের, ধর্মের, আদর্শের।

মিনিট দশ-বারো এভাবে ক্রমাগত লাঠি-প্রহার চলতে থাকে, তবুও মিছিলের লোকেরা শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

॥ ২ ॥

এই মার-দাঙ্গার খবর মূহূর্তে বাজারে গিয়ে পোঁছয়। ইব্রাহিম ঘোড়ার পায়ে চাপা পড়েছে, অনেকে আহত হয়েছে, অনেকের হাত ভেঙ্গেছে ; তবুও তারা পশ্চাদ্‌পসরণ হয়নি, পুলিশ তাঁদের আর এগোতে দিচ্ছে না।

ম্যাকু উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে—আর এখানে থাকা চলে না। আমিও যাচ্ছি।

দীনদয়াল বলে—আমরাও যাচ্ছি, দেখা যাক।

শম্ভু মিনিট কাল চুপ থাকে। সহসা সে দোকান বন্ধ করে ফেলে, তারপর বলে ওঠে—একদিন সকলকেই মরতে হবে। যা হবার হবে, ওরাও তো সকলের জন্য প্রাণ দিচ্ছে। দেখতে-দেখতে অধিকাংশ দোকান বন্ধ হয়ে পড়ে। মিনিট দশ পূর্বেও যারা তামাশা দেখছিল, তারা ইতঃস্ততঃ ছুটে আসে এবং শ'য়ে শ'য়ে মানুষের এক বিশাল দল ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এইসব মানুষের দল উন্মত্ত ও হিংসামত্ত, এদের সিদ্ধান্ত বা আদর্শের কোন পরোয়া নেই। এরা কেবল মরার জন্য নয়, বরং মারার জন্যও প্রস্তুত। অনেকের হাতে লাঠি, অনেকের পকেটে পাথর ভর্তি। কেউ কাউকে কিছু বলে না, কোন জিজ্ঞাসাবাদও নয়। সকলেই মনে এক দৃঢ় সংকল্প নিয়ে, দ্রুত এগিয়ে যায়, যেন মেঘের দল ফুঁসতে ফুঁসতে এগিয়ে চলেছে।

দূর থেকে এই দল দেখার সঙ্গে সঙ্গে সওয়ারদের মাঝে হৈ-চৈ বেঁধে যায়। বীরবলের চেহারা মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। ডি· এম· পি· তার গাড়ী নিয়ে পিছিয়ে যায়। শান্তি ও অহিংসাব্রত-ধারীর ওপর লাঠি চার্জ করা এক ব্যাপার, উন্মত্ত দলের মুখোমুখি হওয়া অন্য ব্যাপার। সওয়ার এবং সেপাইরা পেছনে সরে আসে।

ইব্রাহিমের পিঠের ওপর ঘোড়ার পা পড়েছে। প্রায় অচেতন হয়ে মাটির ওপর পড়েছিল। ঐ সব লোকদের হৈ চৈ কোলাহল শুনে তার চোখ্ আপনা-আপনি উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। একজন যুবককে ইশারায় ডেকে জিজ্ঞেস করে—কৈলাশ, শহর থেকে লোকেরা আসছে নাকি?

কৈলাস এগিয়ে আসা মেঘপুঞ্জ দেখে বলে—তা প্রায় হাজার খানিক লোক হবে।

ইব্রাহিম—তাহলে আর রক্ষে নেই। পতাকা ফিরিয়ে দাও। আমাদের এই মুহূর্তে ফিরে যাওয়া উচিৎ, নইলে ঝড় উঠতে পারে। নিজের ভাইয়ের সঙ্গে লড়াই করবো না। এক্ষুনি ফিরে চলো।

বলতে-বলতে ওঠার চেষ্টা করে, কিন্তু উঠতে পারে না।

ইশারাই যথেষ্ট। সুসংগঠিত সৈন্যের মত লোকেরা আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেছনে ফিরে যায়। পতাকার বাঁশ, উষ্ণীষ এবং রুমাল দিয়ে চট করে একটা স্ট্রেচার তৈরী করে ফেলে। ইব্রাহিমকে লোকেরা তার ওপর শুইয়ে দেয়, তারপর পেছনের দিকে রওনা দেয়। সত্যি কি তারা পরাজিত হয়েছে? কেউ যদি তাকে পরাজিত মনে করে পুলকিত হয়, হতে দিন; কিন্তু বাস্তবে সে এক যুগান্তকারী বিজয় লাভ করেছে। তার জানা আছে, আমাদের সংঘর্ষ নিজের ভাইয়ের সংগে—যাদের হিত কেবলমাত্র পরিস্থিতির কারণে আমাদের শত্রুতা করা উচিৎ নয়। তাছাড়া, সে এও চায় না, শহরে লুঠতরাজ এবং দাঙ্গার বাজার গরম হয়ে পড়ুক এবং আমাদের ধর্মযুদ্ধের শেষে লুন্ঠিত দোকান ভাঙ্গা-চোরা অবস্থায় পড়ে থাকুক। তার বিজয়

প্রাপ্তির উজ্জ্বল চিহ্ন হলো, তিনি জনসাধারণের সহানুভূতিলাভ করেছে। যারা তার প্রতি উপেক্ষা করতো, হাসতো, এখন তার ধৈর্য্য ও সাহস দেখে তারাই সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছে। মনোবৃত্তির এই ব্যাপক পরিবর্তনই হলো আমাদের প্রকৃত বিজয়। কারো সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই, আমাদের উদ্দেশ্য কেবল জনসাধারণের সহানুভূতি লাভ করা, তাদের মনোবৃত্তি পরিবর্তন করা। যেদিন আমরা এই লক্ষ্যে পৌঁছবো, সেদিনই স্বরাজ্য সূর্যের উদয় ঘটবে।

॥ ৩ ॥

তিনদিন অতিক্রান্ত। বীরবল সিংহ তার ঘরে বসে চা খাচ্ছিল, স্ত্রী মিটঠন বাঈ শিশু ক্রোরে সামনে দাঁড়িয়েছিল।

বীরবল সিংহ বলে ওঠে—ঐ সময় আমি কিইবা করতে পারি। পেছনে ডি. এস. পি দাঁড়িয়েছিলেন। যদি ওদের পথ ছেড়ে দিতাম, তাহলে আমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি হতো।

মিটঠন বাঈ মাথা নাড়িয়ে বলে—তুমি অন্তত এটুকু করতে পারতে, যাতে তার মাথায় লাঠির আঘাত পড়তো না। আচ্ছা, তোমার কাজ কি লোকেদের মাথায় লাঠি চালানো? তুমি কি মনে করো, ঐ দলে কোন ভাল মানুষ নেই? এমন কয়েকজন ঐ দলে ছিল, যারা তোমার মত লোকেদের চাকর রাখতে পারে। শিক্ষায় সম্ভবতঃ অধিকাংশ লোক তোমার চেয়ে যোগ্যতর; আর তুমি কিনা ওদের ওপর লাটি চার্জ করলে, ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। এই তোমার পৌরুষ।

প্রত্যুত্তরে বীরবল কিছুটা বেহায়া হাসি হেসে বলে—জানো, ডি. এস. পি আমার নাম নোট করেছেন। সত্যি!

দারোগাবাবু ভেবেছিল, এই খবরটা দিয়ে মিটঠন বাঈকে খুশী

করবে। ভদ্রতা ও ভালমানুষী ওপরকার ব্যাপার ; হৃদয় থেকে নয়, মুখ দিয়ে কেবল বলা হয়। অথচ স্বার্থ ঠিক হৃদয়ের গভীরে বসে থাকে। সেখানে গম্ভীর বিচারের বিষয়।

কিন্তু মিটঠন বাঈয়ের মুখে হাসির কোন রেখা দেখা দেয় না, ওপরকার কথা সম্ভবতঃ গভীরে গিয়ে স্পর্শ করে। বলে—নিশ্চয়ই নোট করে নিয়ে থাকবে, এবং সম্ভবতঃ তোমার দ্রুত উন্নতিও হতে পারে ; কিন্তু নিরপরাধীদের রক্তে রাঙা করে যদি উন্নতি হয়, তাতে আর কি ! মনে রেখো, এটা তোমার কর্তব্য পরায়ণতার পুরস্কার নয়, বরং তোমার দেশদ্রোহিতার মূল্য। তোমার কর্তব্য পরায়ণতার পুরস্কার তখনই লাভ হবে, যখন তুমি খুনীর খোঁজ বার করবে, কোন ডুবন্ত লোককে প্রাণরক্ষা করবে।

সহসা একজন সেপাই বারান্দায় এসে বলে ওঠে—হুজুর, এই যে খাম এনেছি। বীরবল সিংহ বাইরে বেরিয়ে এসে খাম নেয়, ভেতরে সরকারী চিঠি বার করে পড়তে থাকে। পড়ার পর টেবিলে রেখে দেয়।

মিটঠন জিজ্ঞেস করে—উন্নতির পরোয়ানা এসে গেছে বুঝি ?

বীরবল লজ্জা পেয়ে বলে ওঠে—তুমি তো সবকিছুতে ঠাট্টা করো। আজ আবার মিছিল বেরোবে। সঙ্গে থাকার জন্য আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে।

মিটঠন—তাহলে তোমার সোনায়-সোহাগা—তৈরী হয়ে নাও। আজও আবার সে রকম শিকার পাবে। এগিয়ে গিয়ে কেরামতি দেখিও। ডি. এস. পিও নিশ্চয়ই আসবে। এবার তোমার ইন্সপেক্টার হওয়া নিশ্চিত। সত্যি !

বীরবল কিছুটা সঙ্কোচভরে বলে—মাঝে মাঝে তুমি কি সব মাথামুণ্ড কথা যে বল। ধরো, আমি সেখানে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম, তাতে ফল কি হবে ! আমায় অযোগ্য মনে করবে, এবং আমার জায়গায় অন্য কাউকে পাঠাবে। এর ওপর যদি সন্দেহ করে বসে,

স্বরাজ্যবাদিদের প্রতি আমার সহানুভূতি আছে, তাহলে আর কোথাও দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না। বরখাস্ত যদি না-ও বা হই, কিন্তু লাইনে হাজির দিতে হবেই! মানুষ যে সংসারে থাকে, তার চালচলন দেখে সে কাজ করে। আমি বুদ্ধিমান না হতে পারি, কিন্তু এটুকু জানি এঁরা দেশ ও জাতির উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করছে। এও জানা, সরকার এই প্রচেষ্টাকে বানচান করে দিতে চায়। এমন গাধাও নই যে পরাধীনতার জীবনে গর্ব বোধ করবো; কিন্তু পরিস্থিতির ফলে আমি অসহায়।

বাদ্যির শব্দ কানে এসে লাগে। বীরবল সিংহ বাইরে গিয়ে জিজ্ঞেস করে। জানা যায়, স্বরাজ্যঅলাদের মিছিল এগিয়ে আসছে। দ্রুত উর্দি পরিধান করে, পাগড়ি বাঁধে এবং পকেটে পিস্তল রেখে বাইরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া তৈরী। কনস্টেবলরা পূর্বেই তৈরী হয়ে আছে। সকলেই ডবল মার্চ করতে করতে মিছিলের দিকে এগিয়ে যায়।

॥ ২ ॥

পুলিশ বাহিনী ডবল মার্চ করতে করতে পনরো মিনিটের মধ্যে মিছিলের সামনে এসে হাজির হয়। এদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে অগণিত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি বেরোয়, যেন মেঘমণ্ডলে গর্জনের শব্দ হয়, তারপর নিস্তব্ধতা ছেয়ে পড়ে। সেই মিছিল আর এই মিছিল—কত তফাৎ। সেটা ছিল স্বরাজ্য উৎসবের মিছিল, আর এ হলো শহীদের শোক মিছিল। তিন দিনের সাংঘাতিক জ্বর ও যন্ত্রণার পর আজ সেই জীবনের ইতি ঘটেছে, যিনি কখনও পদের জন্য লালায়িত হন নি, কখনও অধিকারের সামনে মাথা নোয়ান নি। মৃত্যুর সময় উইল করেছিলেন, আমার মৃতদেহ গঙ্গায় স্নান করিয়ে যেন কবর দেয়া হয় এবং আমার 'মাজারে' যেন স্বরাজ্যের পতাকা টাঙানো হয়। তাঁর

মৃত্যু-সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই শহরে শোকের পর্দা নেমে আসে। যারাই শোনে, এমনভাবে আৎকে ওঠে, যেন তার বুকেই গুলি এসে বিঁধেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেখার জন্য ছুটে যায়। সমস্ত বাজার বন্ধ হয়ে পড়েছে, এক্কা বা টাঙ্গা গাড়ি অদৃশ্য, শহরে যেন লুঠতরাজ হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে গোটা শহর ভেঙ্গে পড়ে। 'জানাজা' যখন তোলা হয়, কম করেও লাখখানেক লোক তার সহযাত্রী হয়। এমন কোন চোখ অবশিষ্ট নেই, যা অশ্রুপাতে লাল হয়ে ওঠে নি।

বীরবল সিংহ, কনস্টেবল ও সওয়ারদের পাঁচ গজ তফাতে মিছিলের সঙ্গে যাবার হুকুম দিয়ে নিজে পেছনে সরে আসে। পেছনের সারিতে পঞ্চাশ গজ ওকি মহিলাদের দল। দারোগা সেদিকে তাকায়। প্রথম সারিতে মিটঠন বাঈকে দেখা যায়। বীরবলের বিশ্বাস হয় না। ভাল করে লক্ষ্য করে, না, মিটঠন বাঈ বটে। মিটঠন তার দিকে একবার তাকায়, তারপর চোখ ফিরিয়ে নেয়, কিন্তু ঐ এক দৃষ্টি লহমায় এমন ধিক্কার, এমন লজ্জা, এমন ব্যথা, এমন ঘৃণা জড়িত যে বীরবলের শরীরে আপাদমস্তক শিহরণ বয়ে যায়। সে নিজেকে কখনও এতখানি গুরুত্বহীন, এত দুর্বল, এমন অপরাধী অনুভূত হয় নি।

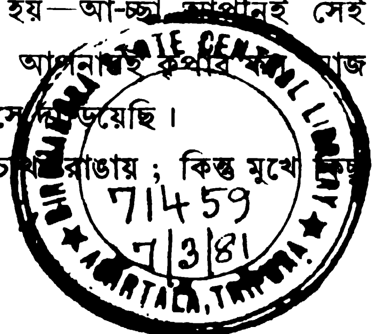
সহসা একজন যুবতী দারোগাকে দেখে বলে ওঠে—কোটাল সাহেব, আমাদের ওপরে যেন লাঠি চালাবেন না। আপনাকে দেখে ভয় লাগে।

অন্যজন বলে—আপনারই কোন ভাই, সেদিন বাজারের চৌরাস্তায় এই বীরপুরুষকে কে আঘাত করেছিল।

মিঠটন্ বলে ওঠে—এনার ভাই নয়, ইনি নিজেই ছিলেন।

সমবেত কণ্ঠ থেকে স্বর উচ্চারিত হয়—আ-চ্ছা, আপনিই সেই মহাশয়! আপনাকে নমস্কার! সত্যি আপনারই কৃপার ফলে আজ আমরাও আপনার লাঠি দর্শনের জন্য এসে দাঁড়িয়েছি।

বীরবল মিটঠন্ বাঈয়ের দিকে চোখ রাঙায়; কিন্তু মুখে কিছু



বলে না। তৃতীয়জন বলে ওঠে—আমরা একটা জলসা করে আপনাকে বরমাল্য পরাবো, এবং আপনার যশগান গাইবো।

চতুর্থজন বলে—আপনাকে একেবারে ইংরেজের মত মনে হয়, সত্যি কি ফর্সা টকটকে রঙ।

একজন বৃদ্ধা চোখ রাঙিয়ে বলে ওঠেন—আমার পেটে যদি এমন ছেলে হতো, তাহলে ঘাড় মটকে মেরে ফেলতাম।

একজন যুবতী বৃদ্ধাকে তিরস্কার করে বলে ওঠে—আপনিও সে কি কথা বলেন মাসীমা, কুকুরও তার নুনের হক আদায় করে নেয়, আর এতো সামান্য মানুষ।

বৃদ্ধা ঝাঁঝি দিয়ে ওঠেন—পেটের দাস, হায় পেট। হায় পেট।

এ কথা শুনে কয়েকজন রমনী বৃদ্ধাকে আড়াল করে নেয়, এবং সে বেচারী লজ্জা পেয়ে বলে ওঠে—ওমা, আমি কিছু বলেছি নাকি? অথচো, ঐ লোকটাকে দেখ, স্বার্থের পেছনে ছুটে চলেছে।

বীরবল আর কিছু শুনতে পারে না। সে ঘোড়া ছুটিয়ে মিছিল থেকে কয়েক গজ পেছনে সরে আসে। পুরুষকে লজ্জায় ফেললে তার ক্রোধ জাগে, নারীকে লজ্জায় ফেললে গ্লানি উৎপন্ন হয়। এই মুহূর্তে বীরবলের এমন সাহস নেই যে, সে এইসব মহিলাবৃন্দের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। অফিসারদের প্রতি তার তীব্র ক্রোধ হয়। কেনই বা আমাকে বার বার এই কাজে নিযুক্ত করছে? আরো অনেকেই তো আছে, তাদের এই কাজে নিযুক্ত করছে না কেন? আমিই কি সবচেয়ে অধম? আমিই কি সবচেয়ে ভাবলেশহীন?

মিট্‌ঠো এই সময় আমাকে কাপুরুষ ও নীচ মনে করছে। এই সময় আমাকে মেরে ফেললেও, সে মুখ খুলবে না। মনে মনে হয়তো বা খুশীই হবে, যাক ভালই হয়েছে। এখন কেউ যদি সাহেবের কাছে গিয়ে রিপোর্ট করে, বীরবল সিংহের স্ত্রী মিছিলে রয়েছে, তাহলে আর দেখতে হবে না। মিটঠো জানে, বোঝেও; তবুও সে বেরিয়েছে। আমায় জিজ্ঞেসটুকুও করেনি। কোন চিন্তা তার নেই, তাই এসব

কথা মনে পড়ে। মিছিলে সকলেই চিন্তাহীন, স্কুল-কলেজের ছাত্র, শ্রমিক, ব্যবসায়ী এদের আবার কিসের চিন্তা! যতো যতো ঝামেলা আমাদের। ছেলে-পেলে আছে, বংশ মর্যাদার কথা ভাবতে হয়। সকলেই আমাকে এমনভাবে দেখছে, যেন খেয়ে ফেলতে চায়।

শহরের মূখ্য সড়ক পথে মিছিল এগিয়ে চলেছে। দু ধারে ছাদের কার্নিশে, বাগানে, গাছের ডালে দর্শকরা প্রাচীরবৎ দাঁড়িয়ে। তাঁদের চোখেমুখে আজ এক নতুন প্রেরণা, এক নতুন উদ্দীপনা, এক নতুন অহঙ্কারের চমক লক্ষ্য করে বীরবল সিংহ। বৃদ্ধদের চোখে মুখে ছিল উদ্দীপনা, যুবকদের উৎসাহ এবং রমনীবৃন্দের চেহারায় অহঙ্কার। স্বরাজ্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ। এখন তাদের যাত্রার মূল লক্ষ্য আর অজানা নেই, পথভ্রষ্টের মত ইতঃস্তত ঘুরে বেড়ানো নয়, নিপীড়িতদের মত অবনত মস্তকে কান্না নয়। স্বাধীনতার সোনালী শিখর সুদূর আকাশে চমক দিতে থাকে। এমন মনে হয়, মাঝপথে খানাখন্দ, বন-জঙ্গল এসবের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই তাঁদের, তাঁরা ঐ সোনালী লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য উৎসুক হয়ে উঠছে।

এগারোটার মধ্যে মিছিল নদীপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছয়, 'জনাজা' নাবানো হয়, সকলেই ইব্রাহিমের মৃতদেহ গঙ্গাস্নানার্থে বয়ে নিয়ে যায়। তাঁর শান্ত, শীতল, পীতমস্তকে লাঠির আঘাত স্পষ্টতঃ লক্ষিত হয়। রক্ত জমাট বেঁধে কালো হয়ে উঠেছে। মাথার দীর্ঘ কেশ-রাজিতে রক্ত জমে থাকায় শিল্পীর তুলির মত লেপটে গেছে। এই শহীদ-এর শেষ দর্শনের জন্য কয়েক হাজার লোক গোল করে দাঁড়িয়ে পড়ে। বীরবল সিংহ পেছনে ঘোড়ার ওপর বসে। লাঠির আঘাত সেও দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরাত্মা বারবার ধিক্কার জানায় নিজেকে। মৃতদেহর দিকে সে আর তাকাতে পারে না। মুখ ফিরিয়ে নেয়। যে মানুষটিকে দেখার জন্য, যাঁর পদধূলি মাথায় ঠেকাবার জন্য লাখ খানিক লোক উদ্বেল হয়ে উঠেছে, তাঁকে আমি এতদূর অপমান করেছি। তার অন্তরাত্মা এই সময় স্বীকার করে,

সত্যি, সেই নির্মম প্রহারে কর্তব্যের লেশমাত্র ছিল না—কেবল স্বার্থ ছিল, কর্তব্যপরায়ন দেখানোর নেশা এবং অফিসারদের খুশী করার লিপ্সা। সহস্র ক্রুদ্ধ চোখ তার প্রতি চেয়ে আছে, অথচ সে সামনে চেয়ে দেখার সাহস পায় না।

একজন কনস্টেবল এসে প্রশংসা করে—হুজুরের হাত বেশ জোরেই পড়েছিল। এখনও খুলি পড়ে আছে। চোখ দুটো খুলে পড়েছে।

বীরবল উপেক্ষা করে— এ কাজে মোটেই পৌরুষ নেই। এ তো হীনপ্রাণ ছাড়া কিছু নয়।

কনস্টেবল পুনরায় খোসামোদ করে—বড্ড উদ্ধত ধরনের লোক ছিল, হুজুর!

বীরবল তীব্র স্বরে বলে ওঠে—চুপ করো! উদ্ধত কাকে বলে জানো? যারা ডাকাতি করে, চুরি করে, খুন করে, উদ্ধত তাদের বলে। আর যাঁরা দেশের ভালোর জন্য নিজের প্রাণ হাতে করে ঘুরে বেড়ায় তাদের উদ্ধত বলা হয় না। আমাদের দুর্ভাগ্য, যাঁর সাহায্য করা উচিৎ, তারই বিরোধ করছি। মোটেই এটা গর্ব ও খুশীর ব্যাপার নয়, বরং লজ্জা ও দুঃখ-জনক ব্যাপার।

মিছিল সেখান থেকে আবার রওনা হয়।

॥ ৫ ॥

শবদেহ মাটির ভেতর শুইয়ে যখন সকলেই ফিরে আসে তখন দুটো বাজে। মিটঠন বাঈ রমনীদলের সঙ্গে কিছুটা এগিয়ে যায়; কুইন্স পার্কের কাছে এসে পা থেমে পড়ে। বাড়ী ফেরার আর তার ইচ্ছে হয় না। সেই জীর্ণ, আহত, রক্তাপ্লুত শবদেহ যেন তার অন্তস্থলে বসে বারবার ধিক্কার জানাতে থাকে। স্বামীর প্রতি তার মন এতদূর বিরূপ হয়ে পড়ে যে, এখন তাকেও ধিক্কার জানাতে ইচ্ছা করে। এমন স্বার্থপর মানুষের কাছে ভয় ছাড়া অন্য কিছুর প্রভাব পড়তে পারে—এ তার বিশ্বাস হয় না।

অনেকক্ষণ পার্কের ঘাসের ওপর বসে ভাবতে থাকে; তবুও নিজের কর্তব্য সম্পর্কে কিছুই স্থির করতে পারে না। পিত্রালয়ে যাওয়া চলে, কিন্তু সেখান থেকে মাস দুই পরে আবার এই স্বামীগৃহে ফিরে আসতে হবে। না, আমি কারও আশ্রিত হব না। আমি কি নিজের জীবন যাপনের জন্য উপার্জন করতে পারি না? সে তন্ন-তন্ন করে নানাবিধ অসুবিধের কল্পনা করে; আজ তার অন্তরাত্মায় দুর্জয় শক্তি ও সাহস জড়ো হয়। এই সব কল্পনা লক্ষ্য করতেই তার নিজের দুর্বলতা ধরা পড়ে।

সহসা, ইব্রাহিম আলীর বৃদ্ধা স্ত্রীর কথা মনে পড়ে। সে শুনেছিল, বৃদ্ধা নিঃসন্তান। বেচারা হয়তো কাঁদছে। সহানুভূতি জানাবার মতো কেউ হয়তো তার কাছে নেই। মিটঠন তার বাড়ীর দিকে এগোয়। ইতিপূর্বে সে তার সহযাত্রী রমনীদের কাছ থেকে ঠিকানা জেনে নিয়েছিল। মনে-মনে ভাবতে থাকে—তাঁর সঙ্গে কি ভাবে দেখা করবো, তাঁকে কি বলবো, তাঁকে কি বলে বোঝাবো। এই সব ভাবতে ভাবতে সে ইব্রাহিম আলীর বাড়ী গিয়ে পৌঁছয়। বাড়ীটা একটা গলির ভেতর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; কিন্তু দোরগোড়ায় বিষণ্নতা ঝরে পড়ছিল। সে ধড়াস ধড়াস বুকে ভেতরে পা রাখে। সামনে বারান্দায় এক খাটে বৃদ্ধা বসে আছে—যাঁর স্বামী স্বাধীনতার বেদীতলে আজ নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর মুখোমুখি শ্বেতবস্ত্র পরিহিত একজন যুবক দাঁড়িয়ে, চোখে অশ্রু, বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলছিল। মিটঠন ঐ যুবককে দেখেই চমকে ওঠে—বীরবল সিংহ।

সে ক্রুদ্ধ আশ্চর্য কণ্ঠে প্রশ্ন করে—তুমি এখানে?

বীরবল সিংহ বলে ওঠে—তুমি যেভাবে, আমিও সেইভাবে। আমার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইতে এসেছি।

মিটঠনের ফর্সা চেহারায় আজ যে গর্ব, উল্লাস ও প্রেমের উজ্জ্বল আভা ছড়িয়ে পড়ে, তা অবর্ণনীয়! মনে হয়, তার জন্ম-জন্মান্তরের ক্লেদ মুছে গেছে; চিন্তা ও মায়ার বন্ধন থেকে সে মুক্ত হয়ে পড়েছে।

# পঞ্চ-পরমেশ্বর

জুম্মন শেখ ও অলগু চৌধুরীর মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব। ভাগ-চাষের ব্যবস্থা আছে! লেন-দেন এর ব্যাপারেও বন্দোবস্ত রয়েছে। এক অপরের প্রতি অটল বিশ্বাস। জুম্মন হজ যাত্রার সময়, তার বাড়ী-ঘর অলগু'র দায়িত্বে ছেড়ে গিয়েছিল, আবার অলগু কখনও বাইরে গেলে জুম্মনের ঘাড়ে বাড়ী-ঘর রেখে যায়। অবশ্য, তাদের মধ্যে খাওয়া-দাওয়ার কোন পাঁট ছিল না, ধর্মের ব্যাপারেও কোন সম্পর্ক নয়; কেবল তাদের ভাবনা-চিন্তায় মিল। বন্ধুত্বের মূলমন্ত্র যা।

এই বন্ধুত্বের জন্ম তখন হয়েছে, যখন তারা দুজনেই বালক; জুম্মনের পূজনীয় অব্বাজান জুমরাতী শেখ অলগুকে শিক্ষাদান করত। অলগু তার গুরুকে অক্লান্ত সেবা করেছিল, এমন কি রেকাবি মাজা-কষা থেকে পেয়ালা ধোয়া পর্যন্ত। গুরুর হুঁকো মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম নেই; এবং প্রত্যেকবার তামাক সাজতে গিয়ে অলগুকে আধঘণ্টাতক্ বই থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখত। অলগুর বাবা ছিলেন প্রাচীনপন্থী। শিক্ষাগ্রহণ অপেক্ষা গুরুর সেবা-শুশ্রূষার প্রতি তার অধিক বিশ্বাস ছিল। তিনি বলতেন, কেবল পাঠ করলেই শিক্ষালাভ হয় না; যা কিছু হয়, তা শুধু গুরুর আশীর্বাদে। গুরুর কৃপা-দৃষ্টির প্রয়োজন। অতএব, অলগুর প্রতি জুমরাতী শেখের আশীর্বাদ বা সৎসঙ্গের যদি কোন ফলপ্রসূ না হয়, তাহলে এই মনে করেই আত্মপ্রসাদ লাভ করুক—বিদ্যার্জনের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি; ভাগ্যে যদি বিদ্যালাভ না থাকে, তাহলে হবে কি করে?

জুমরাতী শেখ অবশ্য নিজে আশীর্বাদে বিশ্বস্ত ছিলেন না। লাঠির

ওপর তাঁর অত্যধিক ভরসা ছিল, এবং সেই লাঠির প্রতাপে আজও আশে-পাশের গাঁয়ে জুম্মনের খাতির। জুম্মনের লেখা মুসাবিদা বা দস্তাবেজে কাছারীর মুহুরীও কলম তুলতে সাহস করে না। গাঁয়ের ডাক-হরকরা, কনস্টেবল বা তশীলদারের চাপরাশি, সকলেই তার কৃপাদৃষ্টির প্রার্থনা করে। তাই অলগুর সম্মান ছিল ধন-সম্পত্তির জন্য, আর জুম্মন শেখ তার অমূল্য বিদ্যার জন্য সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিল।

॥ ২ ॥

জুম্মন শেখের এক বুড়ী খালা (মামী) আছে। তার কাছে সামান্য কিছু ধন-সম্পত্তি ছিল; কিন্তু কোন নিকট আত্মীয় তার ছিল না। জুম্মন অনেক লম্বা-চওড়া প্রতিজ্ঞা ও আশ্বাস দিয়ে সেই সম্পত্তি নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছিল। যদ্দিন হেব্বানামা রেজেষ্ট্রি হয় নি, ততদিন খালাজানকে খুব খাতির যত্ন করেছিল। তাকে নানাধরণের সুস্বাদু খাবার দিয়েছিল। হালুয়া-পোলাও'র ঢালাঢালি। কিন্তু রেজেষ্ট্রির মোহর এইসব যত্ন-আত্তির ওপরও যেন সঙ্গে সঙ্গে মোহর দেগে দেয়। জুম্মনের বিবি, করিমন, রুটির সঙ্গে কটুবাক্যের তীব্র-তীক্ষ্ণ মাংস দিতে থাকে। জুম্মন শেখও নিষ্ঠুর হয়ে পড়ে। এখন বেচারী খালাজানকে প্রায় রোজ নানা ধরণের কথা শুনতে হয়।

ইস্, বুড়ী আরো কতদিন বাঁচবে কে জানে। দু-তিন বিঘে বাঁজা জমি, তাই নিয়ে কত গলা—যেন কিনে নিয়েছে। সম্বরা ডাল ছাড়া ওনার গলা দিয়ে রুটি নামে না। হুঁ, অ্যাদ্দিন ধরে যত টাকা পেটে ঢেলেছি, তা দিয়ে একটা গোটা গাঁ কিনে ফেলা যেত।

দিন কয়েক খালাজান এসব কথা শুধু শুনে যায়। যখন আর সহ্য করতে পারে না, তখন জুম্মনকে অভিযোগ করে। জুম্মন স্থানীয় কর্মচারী, গৃহস্বামীর ব্যবস্থায় দখল দেয়াটা উচিৎ মনে করে না।

আরও দিন কয়েক এমনি কেঁদে-কেটে পার হয়। অবশেষে, খালাজান একদিন জুম্মনকে বলে—তোমার সঙ্গে আমার নির্বাহ হবে না। তুমি বরং আমায় টাকা দিও আমি নিজেই রেঁধে-বেড়ে খাবো।

জুম্মন ধৃষ্টতার সঙ্গে উত্তর দেয়—টাকা কি এখানে গজায়? খালাজান নম্রভাবে বলে—তা আমার খাওয়া-দাওয়া চাই কি না? জুম্মন গম্ভীরস্বরে জবাব দেয়—এখানে কেউ কি মনে করে তুমি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে এসেছো?

খালা চটে ওঠে, সে পঞ্চায়েত ডাকার ভয় দেখান। জুম্মন হেসে ওঠে, কোন শিকারী জালের দিকে হরিণকে এগিয়ে যেতে দেখে মনে মনে যেমন হাসে। সে বলে ওঠে—হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পঞ্চায়েত ডাকতে পারো। তখুনি ফয়সালা হয়ে যাবে। আমারও রাতদিন এই খিচ্‌খিচ্‌ ভালো লাগে না।

পঞ্চায়তে কার জয় হবে, এ ব্যাপারে জুম্মনের কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। আশে-পাশে গাঁয়ের এমন কেইবা আছে, যে তার অনুগ্রহে ঋনী নয়, এমন কে আছে, যে তাকে শত্রু করার সাহস দেখাতে পারে? কার এত স্পর্ধা আছে যে তার সামনা-সামনি এসে দাড়ায়? আকাশ থেকে দেবদূতেরা নেমে ত আর পঞ্চায়ত করতে আসবে না।

॥ ৩ ॥

এরপর দিনকতক বুড়ী খালা একখানি লাঠি নিয়ে আশে-পাশে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়। কোমর বেঁকে ধনুক হয়ে পড়ে। এক-পা চলা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে; কিন্তু ব্যাপারটা শেষ ধাপে এসে পড়েছে। তার সমাধান করা নিতান্ত প্রয়োজন।

এমন কেউ বাকি নেই, যার কাছে বুড়ী তার দুঃখের অশ্রু বিসর্জন করে নি। কেউ-কেউ শুধু ওপর-ওপর হুঁ-হাঁ করে সরিয়ে

দিয়েছে, আবার কেউ কেউ এই অন্যায় শুনে যুগের প্রতি গালাগাল দেয়। বলে—কবরের দিকে পা উঁচিয়ে আছো, আজ হোক কাল হোক বা পরশু হোক মরবেই; অথচ লালসা যায় না। তোমার আর কি চাই এখন? রুটি খাও, আল্লাতাল্লার নাম নাও। চাষ-বাস নিয়ে তোমার মাথাব্যাথার দরকার কি? কয়েকজন নির্বিরোধী লোক, যারা কৌতুকরসের রসাস্বাদন করার ভালো সুযোগ পায়। ঝুঁকে পড়া কোমর, ফোকলা মুখ, শনের মত চুল। এইসব সামগ্রী যখন একত্রিত হয়েছে, লোকেদের হাসিই বা পাবে না কেন? তেমন ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু, দীনবৎসল পুরুষ কমই ছিল, যারা এই অবলা দুঃখিনীর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছে, তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে। চারিদিকে ঘুরে-বেড়িয়ে এসে বেচারী অবশেষে অলগু চৌধুরীর কাছে হাজির হয়। লাঠি ঠুকে-ঠুকে শ্বাস টেনে বলে—বেটা, তুমিও কিছু সময়ের জন্য আমার পঞ্চায়তে চলে এসো।

অলগু—আমায় ডেকে আর কি হবে? কয়েক গাঁ থেকে লোকেরা আসছে।

খালা—আমার বিপদের কান্না সকলের কাছে গেয়েছি। এখন হাজির হওয়া না-হওয়া তোমার ইচ্ছের ওপর।

অলগু—ঠিক আছে, যাবার ব্যাপারে না হয় আমি যাবো; কিন্তু পঞ্চায়তে মুখ খুলবো না।

খালা—কেন বেটা?

অলগু—এর কি জবাব দেব, বল? আমার খুশীই ধরে নাও। জুম্মন আমার পুরনো বন্ধু। তাকে চটাতে চাই না।

খালা—বেটা, তাহলে কি তুমি চটানোর ভয়ে ন্যায়ের কথা বলবে না?

বস্তুতঃ আমাদের সুপ্ত ধর্ম জ্ঞানের যাবতীয় সম্পত্তি লুণ্ঠিত হোক, তার প্রতি কোন ঔৎসুক্য নেই, কিন্তু চ্যালেঞ্জের কথা শুনে সেই ধর্ম জ্ঞান সহসা যেন সচেতন হয়ে ওঠে। তখন তাকে জয় করা অসম্ভব

হয়ে দাড়ায়। অলগু এই প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারে না, কেবল তার হৃদয়ে এই শব্দ অনুরণিত হতে থাকে—

তাহলে কি তুমি চটানোর ভয়ে ন্যায়ের কথা বলবে না ?

॥ ৫ ॥

সন্ধ্যে নাগাদ একটা গাছের তলায় পঞ্চায়ত বসে। সেখ জুম্মন আগে থেকে সতরঞ্চি বিছিয়ে রেখেছে। পান, এলাচ, হুঁকো-তামাক এসবের ব্যবস্থাও সে করেছে। তবে হ্যাঁ, সে নিজে অলগু চৌধুরীর কাছ থেকে সামান্য দূরে বসেছে। পঞ্চায়তে কেউ এলে, সে আনত সেলাম করে তার স্বাগত জানায়। সূর্যাস্তের পর, পাখীদের কিচির-মিচির কলরবে গাছের মাথায় পঞ্চায়ত বসার পর, তলায় তাদের পঞ্চায়তও শুরু হয়। সতরঞ্চীর সমস্ত জায়গা ভরে যায় ; অধিকাংশই তারা অবশ্য দর্শক। নিমন্ত্রিত লোকেদের মধ্যে কেবল তারাই হাজির হয়েছে, জুম্মন শেখের প্রতি যাদের প্রতিশোধ স্পৃহা আছে। একপ্রান্তে আগুন জ্বলছে। নাপিত ঠেসেঠুসে তামাক ভরে দেয়। ফলে, বোঝা বেশ কষ্ট হয়, প্রজ্বলিত কাঠ থেকে বেশী ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে, নাকি তামাকে ধোঁয়া থেকে। ছেলেরা ইতঃস্ততঃ দৌড়ঝাঁপ করছে। কেউ গালাগাল করছে, কেউ বা কাঁদছে। চারিদিকে কোলাহল মুখরিত। গাঁয়ের কুকুর এই সমাবেশকে ভোজ মনে করে দলে-দলে জমায়েত হয়েছে।

'পঞ্চ' লোকেরা বসে পড়তে, বুড়ী খালা তাদের বিনতি জানায়—

'পঞ্চগণ, আজ তিন বছর হলো, আমার যাবতীয় সম্পত্তি আমি ভাগ্নে জুম্মনের নামে লিখে দিয়েছি। তা, আপনারা সকলেই জানেন। জুম্মন আমাকে আমরণ রুটি-কাপড় দেবার কবুল করেছিল ! বছর খানিক তার সঙ্গে আমি কেঁদে-কেটে কাটিয়েছি। কিন্তু, এখন দিন-রাতের কান্না আর সহ্য হয় না। আমি এখন পেটের রুটি

পাই না। অসহায়া বিধবা মেয়ে মানুষ আমি। কাছারী-দরবারী করতে পারি না। তোমাদের ছাড়া আর কাকেই বা নিজের দুঃখ শোনাবো? তোমরা যে উপায় বার করে দেবে, আমি সেই পথে চলবো। যদি আমার মাঝে কোন দোষ-ত্রুটি পাও, তাহলে আমার মুখে থাপ্পর মেরো। আর যদি জুম্মনের কোন অন্যায় দেখো, তাহলে ওকে বোঝাও—কেন সে একজন নিঃসহায় বিধবার অভিসম্পাত কুড়োচ্ছে। আমি পঞ্চগণের হুকুম মাথায় পেতে নেবো।

রামধন মিশ্র, যার কয়েকজন আসামীকে জুম্মন আপন গাঁয়ে জায়গা দিয়েছে, বলে ওঠে জুম্মন মিঞা, কাকে 'পঞ্চ' স্বীকার কর? এখনই এর ঠিক-ঠাক করে নাও। পরে 'পঞ্চ' যা বলবে, তোমাকে তা মানতে হবে।

জুম্মন এই সময় সদস্যদের মধ্যে বিশেষতঃ তাদেরই দেখা পায়, যাদের সঙ্গে কোন-না-কোন কারণে তার অপ্রীতি সম্পর্ক। জুম্মন বলে ওঠে—পঞ্চের হুকুম হলো আল্লার হুকুম। খালাজান যাঁকে ইচ্ছে, স্বীকার করতে পারেন। আমার কোন আপত্তি নেই।

খালা চেঁচিয়ে ওঠে—ওরে আল্লার বন্দে! পঞ্চদের নাম বলছো না কেন? আমিও যাতে কিছু জানতে পারি।

জুম্মন ক্রোধে বলে ওঠে—এখন এসময় আমার মুখ খুলিও না। তোমার যখন গরজ যাকে ইচ্ছে—পঞ্চ করো।

খালাজান জুম্মনের আক্ষেপ ধরে ফেলে, সে বলে—বেটা খোদাকে ভয় করো। পঞ্চ কারো বন্ধু হয় না, শত্রুও হয় না। কি বল তুমি। তোমার যদি কারো ওপর বিশ্বাস না থাকে, বাদ দাও, অলগু চৌধুরীকে স্বীকার করো ত? নাও, তাকেই আমি 'সরপঞ্চ' স্বীকার করছি।

জুম্মন শেখ আনন্দে ফুলে ওঠে; কিন্তু ভাবটুকু লুকিয়ে বলে—ঠিক আছে, অলগু চৌধুরীই হোক! আমার কাছে যেমন রামধন, তেমন অলগু-ও।

অলগু এই ঝামেলায় জড়াতে চাইছিল না। সে পাশ কাটাতে

চায়। বলে—খালা, তুমি ত জানো জুম্মনের সঙ্গে আমার গভীর বন্ধুত্ব।

খালা গম্ভীর স্বরে বলে—বেটা, বন্ধুত্বের জন্য কেউ নিজের ইমান বিক্রী করে না। পঞ্চদের বুকে সর্বদা খোদা বাস করেন। পঞ্চদের মুখ থেকে যে কথা বেরোয়, তা খোদার তরফ থেকেই বেরোয়।

আলগু চৌধুরী 'সরপঞ্চ' হয়। রামধন মিশ্র এবং জুম্মনের অন্যান্য বিরোধীরা বুড়ীকে মনে মনে শাপ-শাপান্ত করে ছাড়ে।

অলগু চৌধুরী বলে ওঠে—শেখ জুম্মন! আমি আর তুমি পুরনো বন্ধু। যখন দরকার পড়েছে, তুমি আমায় সাহায্য করেছো; আবার আমার সাধ্যমত তোমার সেবা করেছি। কিন্তু, এখন এসময়ে তুমি এবং বুড়ী খালা, দুজনেই আমার চোখে সমান। পঞ্চদের কাছে তোমার যা আর্জি পেশ করার আছে, করো।

জুম্মনের পূর্ণ বিশ্বাস, এবার বাজি তারই। অলগু এসব কথা কেবল লোক দেখানোর জন্য বলছে। তাই, প্রশান্তচিত্তে বলে ওঠে—পঞ্চগণ, তিন বছর হলো, খালা তাঁর সম্পত্তি আমার নামে হেব্বানামা করে দেয়। আমি তাকে আমরণ ভাত-কাপড় দেবো বলে কবুল করি। খোদা সাক্ষী, আজ অবধি আমি খালাজানকে কোন রকম কষ্ট দিই নি। আমি তাঁকে আমার আম্মাজানের মত দেখি। তাঁকে খিদমৎ করা আমার কর্তব্য। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে কিছু খিটিমিটি লেগে থাকে, তা কি আমার আয়ত্তে? খালাজান আমার কাছ থেকে আলাদা করে মাস-খোরাকী চাইছেন। সম্পত্তি তার কি আছে, পঞ্চদের কাছে এ আর লুকনো নেই। তা থেকে এমন কিছু আয় হয় না, যাতে মাস-খোরাকীর খরচ দিতে পারি। তাছাড়া দলিলে মাস-খোরাকীর খরচের কোন উল্লেখ নেই। নইলে, ভুল করেও আমি এই ঝামেলায় জড়াতাম না। ব্যস, আমার শুধু এটুকুই বলা। এবার পঞ্চদের হাতে, যা মীমাংসা করার করবেন।

অলগু চৌধুরীর প্রায়শঃ কাছারীতে কাজ পড়ে। তাই, সে

আইন সম্পর্কে ওয়াকিরহাল। সে জুম্মনকে জেরা করতে শুরু করে। এক একটি প্রশ্ন জুম্মনের বুকে হাতুড়ির চোট এসে পড়তে থাকে। রামধন মিশ্র এই সব প্রশ্ন শুনে বিমোহিত। জুম্মন বিস্মিত; অলগুর হয়েছে কি! এই তো অলগু আমার সঙ্গে বসে কত কি গল্প করছিল। এরি মধ্যে সে এমনভাবে কায়া-মন পাল্টে ফেলেছে, যে আমাকে গোড়া শুদ্ধ উপড়ে ফেলতে চাইছে। জানিনা, কবেকার ঝাল মেটাতে চাইছে সে। এতদিনের বন্ধুত্ব কি কোন কাজেই লাগবে না?

জুম্মন শেখ! পঞ্চগণ এই মামলার বিচার-বিবেচনা করে দেখেছে। তাদের বিচারে এটা নীতি সঙ্গত মনে হয়েছে যে খালাজানকে মাসোহারা দেয়া হোক। আমাদের ধারনায়, খালাজানের সম্পত্তি থেকে এতটা লাভ অবশ্য হয় যাথেকে তাকে মাস-খোরাকী দেয়া যেতে পারে। এটাই আমাদের মীমাংসা। যদি জুম্মন খরচ দিতে রাজী না হয়, তাহলে হেব্বানাসা রদ মনে করা হবে।

॥ ৫ ॥

এই মীমাংসার ফল শোনার সঙ্গে সঙ্গে জুম্মন একেবারে চুপ হয়ে পড়ে। আপন বন্ধুই যখন শত্রুর মত ব্যবহার করে, এবং গলায় ছুরি বসায়—একে সময় খারাপ ছাড়া আর কি বলবে? যার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা, সেই কিনা উপযুক্ত সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল। সত্যি, এ রকম সময়ে প্রকৃত বন্ধুর পরীক্ষা হয়। কলিকালের বন্ধুত্ব! লোকেরা যদি এমন কপট-বিশ্বাসঘাতক না হয়, দেশে তাহলে এমন বিপত্তিই বা আসে কেন? কলেরা প্লেগ মহামারী এই সব ব্যাধি-রোগ দুষ্কর্মদেরই দণ্ড স্বরূপ।

কিন্তু রামধন মিশ্র এবং অন্যান্য পঞ্চরা আলগু চৌধুরীর এই নীতিপরায়ণতার প্রশংসা সহৃদয়ে করে। তারা বলে—হ্যাঁ, এর

নামই পঞ্চায়ত। দুধ এবং জল ঠিক-ঠিক ভাবে পৃথক করে দিয়েছে। বন্ধুত্ব আপন স্থানে; কিন্তু ধর্ম পালন করাই প্রধান ব্যাপার। এমন সত্যবাদী লোকেদের জন্যই পৃথিবী আজও টিঁকে রয়েছে, নইলে কবে রসাতলে চলে যেত।

এই রায়দান অলগু ও জুম্মনের বন্ধুত্বের গভীরতায় ফাটল ধরিয়ে দেয়। এখন তাদের আর একসঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় না। এতদিনকার পুরনো বন্ধুত্বের গাছ সততার সামান্য বাতাসটুকু সহ্য করতে পারে না। সত্যি, যেন বালির ওপর গাছ দাঁড়িয়ে ছিল।

তাদের মধ্যে এখন ভদ্রতা সৌজন্যতা শিষ্টাচারের ব্যবহার বেশী মাত্রায় হতে থাকে। একে-অপরকে বেশী মাত্রায় অভিবাদন জানায়। তারা মেলা-মেশা করে বটে, কিছুটা তরোয়ালের সঙ্গে ঢালের মেশা —সেই রকম।

জুম্মনের হৃদয়ে বন্ধুর কুটিলতা অষ্টপ্রহর ফুটে ওঠে। তার মনে সব সময় এই চিন্তাই ছেয়ে থাকে কি করে এর প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ পাওয়া যায়।

৬ ॥

শুভ কাজের সিদ্ধিলাভ দেরীতে হয়; কিন্তু মন্দ কাজের সিদ্ধিলাভের ব্যাপারে এ প্রশ্ন টেঁকে না। জুম্মনের প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ ঘটে। গতবছর অলগু চৌধুরী বটেসর মেলা থেকে বলদের একটা খুব ভালো জোড়া কিনে এনেছিল। পশ্চিমী জাতের সুন্দর শিঙঅলা বলদ। মাসভর আশে-পাশে গাঁয়ের লোকেরা দেখতে আসে। দৈব যোগে জুম্মনের পঞ্চায়তের এক মাস পরেই এই জোড়ার একটা বলদ মারা যায়। জুম্মন তার বন্ধুদের বলে— বেইমাইনীর সাজা দেখলে তো। মানুষেরা অপেক্ষা করতে পারে,

কিন্তু খোদা ভালমন্দ সমান চোখে দেখেন। অলগু'র সন্দেহ হয়, জুম্মনই বলদকে বিষ দিয়েছে। চৌধুরীও জুম্মনকে এই দুর্ঘটনায় দোষারোপ করে। সে বলে—জুম্মন কিছু একটা করে দিয়েছে। এই বিষয় নিয়ে চৌধুরানী ও করিমন বিবির সঙ্গে একদিন ভয়ংকর বাদ-বিবাদ ঘটে। দুই দেবীই শব্দ বাহুল্যে নদী বইয়ে দেয়, ব্যঙ্গ-বক্রোক্তি অন্যোক্তি এবং উপমা-অলঙ্কারে কথা হয়। জুম্মন কোন রকমে শান্তি স্থাপন করে। সে তার বিবিকে ধমক-বকুনি দিয়ে ঠাণ্ডা করে। তাকে সেই রণভূমি থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। ওদিকে অলগু চৌধুরী বোঝানোর ব্যাপার তার তর্কপূর্ণ লাঠি দ্বারাই শেষ করে।

এখন, একটা বলদ দিয়ে কি কাজ হবে? তার জোড়া অনেক খোঁজা হল; কিন্তু পাওয়া গেল না। নিরুপায় হয়ে এটাই স্থির করে, বলদটাকে বিক্রী করে দেবে। সমঝু সাহু নামে গাঁয়ে একজন একাগাড়ী চালায়। গাঁ থেকে গুড়-ঘি বয়ে হাটে নিয়ে যায়, হাট থেকে সে তেল-নুন ভরে আনে, তারপর গাঁয়ে সেটা বিক্রী করে। এই বলদের দিকে তার মন ছোক ছোক করে। ভাবে, এই বলদটা যদি পাওয়া যায়, তাহলে গোটা দিনে বিনে-বাধায় তিন খেপ করা যায়। ইদানীং একটা খেপে তার কাজ চালাতে হয়। সে এসে বলদ দেখে, গাড়ীতে জুতে দৌড় করায়, লোম-ভুরু দেখে পরখ করে, দরদস্তুর সেরে তারপর বলদটাকে দরজায় এনে বেঁধে রাখে। এক মাসে দাম শোধ করার শর্তে। চৌধুরীর-ই গরজ, তাই লোকসানের পরোয়া করে না।

সমঝু সাহু নতুন বলদ পায়, আর অমনি খেপ দেওয়া শুরু করে দেয়। একদিনেই তিন-তিন, চার-চার খেপ করতে শুরু করে। খাবার চিন্তা নেই, জলেরও চিন্তা নেই, কেবল খেপ পূরণ করা নিয়ে তার দরকার। হাটে নিয়ে যায়, সেখানে কিছু শুকনো ভূষি সামনে ফেলে ফেলে দেয়। বেচারা জন্তু সুস্থির হয়ে তখনও দম নিতে

পারেনি, অমনি আবার গাড়ীর সঙ্গে জুতে দেয়। অলগু চৌধুরীর বাড়ীতে যখন বলদটা ছিল, তখন যেন শান্তির বাঁশী বাজত। ছ-মাসে ন-মাসে বলদটাকে কখনও বদলিতে জোতা হত। তখন খুব লম্ফ-ঝম্ফ করত, নাচত এবং মাইল-ছু-মাইল দৌড়ে চলে যেত। তখন বলদের খোরাক ছিল পরিষ্কার জল, গলে যাওয়া অড়হরের ডাল এবং ভূষির সঙ্গে খৈল; শুধু তাই নয়; মাঝে মাঝে ঘি-এর স্বাদও চাখতে পেত। সকাল-সন্ধ্যে কেউ একজন তার গা রগড়াতো, মুছে দিতো, সারা গা'য়ে হাত বুলাতো। হায়, কোথায় সেই সুখ-শান্তি, আর কোথায় এই আট প্রহর খেপ মারা! মাস খানেকের মধ্যেই সে রোগা হয়ে পড়েছে। দূর থেকে একার হাতল দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার রক্ত যেন শুকিয়ে যায়, এক পা হাটা দুষ্কর হয়ে পড়ে। হাড় বেরিয়ে জিরজিরে হয়ে পড়েছে, অথচ কি কোমল ছিল তার শরীর। সামান্য মা'র বরদাস্ত করতে পারতো না।

একদিন চতুর্থ খেপে সাহু দুনো বোঝা তোলে। সারা দিনের ক্লান্ত জন্তু, পা উঠতে চায় না। উপরন্তু সাহু চাবুক মারতে থাকে। তারপর আর কি, বলদটি তখন বুক ফাটিয়ে দৌড়োতে শুরু করে। কিছুটা দূর দৌড়য়, তারপর চায় একটু দম নিতে। কিন্তু সাহুর তাড়াতাড়ি পৌছনোর ভাবনা, তাই সে আরও কয়েকবার নির্মম-ভাবে চাবুক মারে। বলদটা আরেকবার জোর লাগায়; কিন্তু এবার শক্তি সম্পূর্ণ জবাব দেয়। সহসা ধপ করে মাটির ওপর থুবড়ে পড়ে, আর এমনভাবে পড়ে যে আর উঠতে পারে না। সাহু তবুও মারধোর করে, পা ধরে টানাটানি করে, নাকের ভেতর খুটো সেঁধিয়ে দেয়; কিন্তু মৃত জন্তু কি আর উঠতে পারে? তখন সাহুর কিছুটা আশঙ্কা জাগে। সে বলদটাকে ভালো করে লক্ষ্য করে, গাড়ী থেকে দড়ি খুলে পৃথক করে; ভাবতে থাকে এবার বাড়ী সে কি করে পৌছবে। অনেকবার চিৎকার-ডাকাডাকি করে; কিন্তু গাঁয়ের পথ শিশুদের চোখের মত—সাঁঝ নাবলেই বুজে আসে। কারো দেখা

পায় না। কাছে পিঠে কোন গাঁ নেই। ক্রোধে সে মৃত বলদটাকে ঘষটাতে থাকে, এবং অভিশাপ দিতে থাকে—হতভাগা! তুই যখন মরলি, বাড়ীতে গিয়ে মরতিস! শালা মাঝ-রাস্তায় মরে রইলি। এখন কে গাড়ী টানবে? ক্রমশঃ সাহু রাগে ক্রোধে জ্বলতে-পুড়তে থাকে। কয়েক বস্তা গুড় ও কয়েক পিপে ঘি বিক্রী করেছিল, দুই-আড়াই-শো টাকা কোমরে বাঁধা। এ ছাড়া গাড়ীর ওপর কয়েক বস্তা লবণ রয়েছে, সুতরাং ফেলে রেখেও যেতেও পারছে না। নাচার হয়ে বেচারা গাড়ীতেই শুয়ে পড়ে। ঠিক করে, রাত সেখানেই জাগবে। গাঁজা টানে, গান করে, কখনও বা হুকো টানে। এই করে সাহু মাঝরাত অব্দি ঘুম কাটায়। তার ধারণায় সে জেগেই আছে; কিন্তু ঊষার ঝলসানিতে ঘুম ভাঙ্গতে সে কোমরে হাত রাখে, দেখে থলে গায়েব। ঘাবড়ে গিয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখে, কয়েক কানেস্তারা তেলও গায়েব। আপশোসে বেচারা কপালে করাঘাত করতে থাকে, আছড়াতে থাকে। ভোর বেলায় কেঁদে-কেটে অবশেষে বাড়ী গিয়ে পৌছয়। সাহু-গিন্নী যখন এই দুঃসংবাদ শোনে, প্রথমে কাঁদে, তারপর অলগু চৌধুরীকে গালাগাল দিতে থাকে—পাজী, এমন একটা অলুক্ষণে বলদ দিয়েছে যে সারা জন্মের আয় সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে।

এই ঘটনার কয়েকমাস অতীত হয়ে গেছে। অলগু যখনই তার বলদের দাম চায়, তখনই সাহু ও সাহুআইন, দুজনেই ঝগড়াটে কুকুরের মত তাড়া করে ওঠে, আজে-বাজে বকতে থাকে—! আমার সারা জীবনের আয় লুঠ হয়ে গেছে, সব্বোনাশ হয়ে গেছে; আর উনি কিনা দাম চাইতে এসেছেন! মড়া বলদ দিয়েছে, তার আবার দাম! চোখে ধুলো দিয়ে গেছে, সর্বনেশে বলদ গলায় বেঁধে দিয়েছে, আমাদের কি আকাঠ-ভোঁদা ভেবে নিয়েছো? আমরাও বেনের বাচ্চা, বোকা-হাবা অন্য কোথাও খোঁজ কর। আগে কোন খানা-খন্দে মুখ ধুয়ে এসো, তারপর দাম নিও। যদি মন না মানে,

আমার বলদটাকে খুলে নিয়ে যাও। এক মাসের বদলে দু-মাস চাষ করো। আর কি চাই ?

চৌধুরীর অশুভাকাঙ্খীর অভাব ছিল না। এমত অবস্থায় তারাও একজোট হয়ে পড়ে, এবং সাহুর বক্‌বকানি সমর্থন করে। কিন্তু, এভাবে দেড়'শ টাকা মেরে দেয়া সহজ ব্যাপার নয়। চৌধুরীও একবার গরম হয়ে ওঠে। সাহু রেগে গিয়ে লাঠির খোঁজ করতে ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢোকে। সাহুআইন তখন সামনে এগিয়ে আসে। কথা কাটাকাটির ঠেলায় ক্রমশঃ হাতাহাতির পর্য্যায়ে এসে দাড়ায়। সাহুআইন তখন ঘরে ঢুকে গিয়ে আগল এঁটে দেয়। চেঁচামেচি গোলমাল শুনে গাঁয়ের কয়েকজন নিরীহ লোক এসে জমা হয়। তারা দুজনকেই বোঝায়। সাহুকে আশ্বাস দিয়ে ঘর থেকে বার করে আনে। পরামর্শ দেয়, এভাবে কিছুঁ হবে না। বরং পঞ্চায়ত ডাকো! যা মীমাংসা করবে, সেটাই স্বীকার করে নাও। সাহু রাজী হয়। অলগুও স্বীকার করে নেয়।

॥ ৭ ॥

পঞ্চায়তের প্রস্তুতি চলে। দু-পক্ষই নিজের-নিজের দল পাকাতে শুরু করে। এরপর, তৃতীয় দিনে ঠিক সেই গাছের তলায় পঞ্চায়ত বসে। ঠিক সেই সন্ধ্যাকাল। খেত-মাঠে কাকেরা পঞ্চায়ত করছিল। বিবাদগ্রস্ত বিষয় হলো, মটর দানায় কাকেদের স্বত্ব আছে কিনা। যতক্ষণ না এই প্রশ্নের সমাধান হয়, ততক্ষণ তারা রক্ষকদের ডাকে নিজেদের অখুসী প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করে। গাছের ডালে বসা শুক-মণ্ডলীর মাঝে প্রশ্ন ছিল, তাদের চপল প্রগলভ বলার কোন অধিকার কি মানুষের আছে ? তারা নিজেরাই আপন বন্ধুকে বঞ্চিত করতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না।

পঞ্চায়ত বসতেই রামধন মিশ্র বলে—আর দেরী কেন? পঞ্চদের নির্বাচন করে ফেলা দরকার। চৌধুরী বলো, কাকে-কাকে তুমি 'পঞ্চ' স্বীকার করছো।

অলগু দীনভাবে বলে—সমঝু সাহুই ঠিক করুক।

সমঝু উঠে দাঁড়ায়, তারপর জোর গলায় বলে ওঠে—আমার তরফ থেকে জুম্মন শেখ।

জুম্মনের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে অলগু চৌধুরীর বুক ধড়াস করে করে ওঠে, কেউ যেন সহসা তাকে চপেটাঘাত করেছে। রামধন অলগুর বন্ধু। সে ব্যাপারটা বুঝতে পারে। জিজ্ঞেস করে—চৌধুরী, তোমার কোন আপত্তি নেই তো?

চৌধুরী হতাশ গলায় বলে—না, আমার আপত্তি কেন হবে?

আপন উত্তর দায়িত্বের জ্ঞান অনেক সময় আমাদের সংকুচিত ব্যবহারের সংস্কারক হয়ে ওঠে। যখন আমরা পথ ভ্রমে ঘুরে মরি, তখন এই জ্ঞানই আমাদের বিশ্বাস্য পথ-প্রদর্শক হয়ে দাঁড়ায়।

পত্রিকা সম্পাদক নিজের শান্তি-গৃহে বসে ধৃষ্টতা ও স্বাধীনভাবে প্রবল লেখনী দ্বারা মন্ত্রি-মণ্ডলের আক্রমণ করে; কিন্তু এমন সুযোগ আসে যখন সে মন্ত্রিমণ্ডলে যোগদান করে! সভা-ভবনে পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তার লেখনি মর্মজ্ঞ, বিবেচনা-প্রসূত, ন্যায়-পরায়ণ হয়ে ওঠে—তার একমাত্র কারণ হলো উত্তরদায়িত্বের জ্ঞান। তরুণ যুবক যুবাবস্থায় প্রচণ্ড উগ্র থাকে। বাবা-মা তার সম্পর্কে কতই না দুশ্চিন্তিত হয়। তারা তাকে বংশের কুলাঙ্গারও মনে করে; কিন্তু কিছুটা সময়ের মধ্যে সংসারের বোঝা যখন ঘাড়ে পড়ে, অমনি বিক্ষিপ্ত চিত্ত, উন্মত্ত যুবক ধৈর্যশীল, শান্ত হয়ে পড়ে—এসবই উত্তর দায়িত্বের জ্ঞানের ফল।

'সরপঞ্চের' আসন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে জুম্মন শেখের মনেও দায়িত্ব ভাবনা জেগে ওঠে। সে ভাবে, এই সময় ন্যায় ও ধর্মের সর্বোচ্চ আসনে বসে আছি। আমার মুখ থেকে এই সময় যা

বেরোবে, তা দৈববাণী সদৃশ এবং দৈববাণীতে আমার মনোবিকার কদাপি সমাবেশ হওয়া উচিৎ নয়, সততা থেকে আমার এক তিলও নড়া উচিৎ নয়।

পঞ্চরা দু-পক্ষের সওয়াল-জবাব করতে শুরু করে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দু-দল আপন পক্ষের সমর্থন করতে থাকে। তবে একটা ব্যাপারে সকলেই একমত যে সমঝু'র উচিৎ বলদের দাম শোধ করা। কিন্তু দুজন এই কারণে রেয়াৎ করতে চাইছিল যে বলদের মৃত্যুতে সমঝু'র বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। এর প্রতিকূলে দুজন সভ্য মূল্যের অতিরিক্ত সমঝুকে দণ্ড দিতে চাইছিল—যাতে কেউ আর পশুর সঙ্গে এমন নির্মম ব্যবহার করার সাহস না করে। পরিশেষে জুম্মন তার নির্ণয় শোনায়।

অলগু চৌধুরী এবং সমঝু সাহু! পঞ্চরা তোমাদের মামলা ভাল-ভাবে বিচার করেছে। সমঝু'র উচিৎ, বলদের পুরো দাম দেয়া। যে সময় সে বলদ নিয়েছিল, তখন তার কোন রোগ ছিল না। যদি সে-সময়ে দাম দিয়ে দিত, তাহলে আজ সমঝু ব্যাপারটাকে ঘোরাবার জন্য আগ্রহী হত না। বলদের মৃত্যু শুধু এই কারণে ঘটেছে যে, তার কাছ থেকে কঠিন পরিশ্রম নেয়া হয়েছে—এবং তার খাওয়ার কোন সুব্যবস্থা করা হয়নি।

রামধন মিশ্র বলে—সমঝু জেনে-শুনে বলদটাকে মেরেছে, অতএব তার সাজা পাওয়া উচিৎ।

জুম্মন বলে—এটা অন্য সওয়াল। এর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

ঝগড়ু সাহু বলে—সমঝুর প্রতি কিছুটা রেহাই হওয়া উচিৎ।

জুম্মন বলে—এটা সম্পূর্ণ অলগু চৌধুরীর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। সে যদি রেহাই করে, সেটা হবে তার ভাল-মানুষী।

অলগু চৌধুরী আনন্দে ফেটে পড়ে। উঠে দাঁড়ায় এবং জোর গলায় বলে ওঠে পঞ্চ-পরমেশ্বরের জয়।

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে প্রতিধ্বনি ওঠে—পঞ্চ-পরমেশ্বরের জয়।

প্রত্যেকেই জুম্মনের নীতিকে প্রশংসা করে—হ্যাঁ, একেই বলে ন্যায়। এ তো আর সাধারণ লোকের কাজ নয়, পঞ্চে যে পরমেশ্বর বাস করেন—এটা তারই মহিমা। পঞ্চের সামনে কে আর অচলকে খাড়া করতে পারে?

কিছুক্ষণ পরে জুম্মন অলগুর কাছে এগিয়ে যায়, তার গলা জড়িয়ে ধরে বলে—ভাইজান, যেদিন তুমি আমার পঞ্চায়ত করেছিলে, সেদিন থেকে আমি তোমার প্রাণঘাতক শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু, আজ আমি বুঝতে পেরেছি যে পঞ্চের আসনে বসে কেউ কারো বন্ধু হয় না, শত্রু হয় না। ন্যায় ছাড়া সে আর কিছু দেখতে পায় না। আজ আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, পঞ্চের কণ্ঠ থেকে খোদার কথাই বেরোয়।

অলগু কাঁদতে থাকে। অশ্রু তাদের দুজনের মনের মলিনতা ধুইয়ে দেয়। বন্ধুত্বের শুকিয়ে যাওয়া লতা পূর্ণ হরিৎ হয়ে পড়ে।

## প্রায়শ্চিত্ত

দপ্তরে একটু দেরী করে আসা অফিসারদের গর্বের ব্যাপার। যে যত বড় অফিসার সে তত দেরী করে আসে; এবং ততই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। চাপরাশির হাজিরা চব্বিশ ঘণ্টার। সে ছুটিতে যেতে পারে না। তাকে নিজের বদলির লোক দিতে হয়। যা হোক, বেরিলি জেলা বোর্ডের হেড ক্লার্ক বাবু মাদারীলাল এগারোটার সময় যখন দপ্তরে আসে, দপ্তর তখন ঘুম থেকে জেগে ওঠে। চাপরাশি দৌড়ে গিয়ে পাগাড়ী ধরে, আর্দালী দৌড়ে গিয়ে কামরার চিক তুলে ধরে, এবং জমাদার 'ডাকে'র বাক্স টেবিলের ওপর এনে রাখে।

মাদারীলাল সবে প্রথম খামখানি খুলেছে, অমনি তার চোখে-মুখের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। কয়েক মিনিট সে বিস্মিত অবস্থায় দাড়িয়ে থাকে, যেন তার যাবতীয় জ্ঞানেন্দ্রিয় শিথিল হয়ে পড়েছে। জীবনে সে বড়-বড় আঘাত পেয়েছে, কিন্তু এতখানি বিচলিত সে কখনও হয়নি। ব্যাপার হলো, বোর্ডে সেক্রেটারীর যে পদ আজ মাসাবধিকাল শূন্য ছিল, সরকার সেই পদ সুবোধচন্দ্রকে দিয়েছে। সুবোধ-চন্দ্র সেই লোক, যার নামে মাদারীলাল ঘৃণা বোধ করে। সুবোধ-চন্দ্র তার সহপাঠী ছিল, এবং তাকে পরাভূত করার জন্য সে কতই না চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কখনও সফল হয়নি। সেই সুবোধ কিনা আজ তার অফিসার হয়ে আসছে। ইদানীং কয়েক বছর সুবোধের কোন সংবাদ নেই। তবে এটুকু জানা ছিল, সে নাকি ফোর্সে ভর্তি হয়েছে। মাদারীলাল ভেবেছিল—সেখানেই সুবোধ মরে গেছে হয়তো; কিন্তু আজ যেন সে বেঁচে উঠেছে, এবং সেক্রেটারী হয়ে আসছে। মাদারী-লালকে এখন তার অধীনে কাজ করতে হবে। এই অপমানের চেয়ে মৃত্যুও অনেক শ্রেয় ছিল। স্কুল ও কলেজের যাবতীয় ঘটনা সুবোধের মনে আছে নিশ্চয়ই। মাদারীলাল তাকে তখন কলেজ থেকে বার করে দেবার জন্য কয়েকবার মন্ত্রণা দিয়েছিল, মিথ্যে দোষারোপ করেছিল, দুর্নাম করেছিল। সুবোধ কি সেসব ভুলে গেছে? না, কক্ষনো নয়। সে এসেই পুরনো রাগের প্রতিশোধ তুলবে। মাদারী-বাবু নিজের প্রাণ-রক্ষার কোন উপায় খুঁজে পায় না।

মাদারী ও সুবোধের গ্রহেও যেন বিরোধ ছিল। দুজনে একই দিনে, একই বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল, এবং প্রথম দিনেই বুকে ঈর্ষা ও দ্বেষ-এর ফুল্‌কি জ্বলে উঠেছিল—যা আজ কুড়ি বছর পার করার পরও নেভে নাই। সুবোধের অপরাধ—সে মাদারীলাল থেকে প্রতিটি ব্যাপারে এগিয়ে ছিল। শরীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, রঙ-রূপ, আচার-ব্যবহার, বুদ্ধি-বিদ্যা, সব ব্যাপারে সে ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মাদারী-লাল তার এই অপরাধ কখনও ক্ষমা করে নাই। কুড়ি বছর ধরে

সুবোধ নিরবিচ্ছিন্নভাবে তার বুকে কাঁটা হয়ে থাকে। তারপর সুবোধ ডিগ্রী নিয়ে দেশের বাড়ীতে ফিরে যায়, এবং মাদারী ফেল করে এই দপ্তরে চাকরি নেয়—তখন যেন তার হৃদয় শান্ত হয়। পরে যখন জানতে পারে সুবোধ বসরা যাচ্ছে, মাদারীলালের চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যাক্, এতদিনে তার বুক থেকে পুরনো ফাঁস বেরিয়ে গেছে। কিন্তু, হা হতভাগ্য! আজ সেই পুরনো ফোঁড়া শতগুণ যন্ত্রণা ও দপদপানিতে টাটিয়ে ওঠে। আজ তার ভাগ্য সুবোধের হাতে। ঈশ্বর এমন অন্যায়পরায়ণ! বিধি এত কঠোর!

মন শান্ত হয়ে এলে, মাদারীলাল দপ্তরের ক্লার্কদের সরকারী আদেশ শুনিয়ে বলে—এবার আপনারা একটু হাত-পা সামলে থাকবেন। সুবোধচন্দ্র তেমন লোক নন, যিনি ভুল ক্ষমা করবেন।

একজন ক্লার্ক জিজ্ঞেস করে,—খুবই কি কড়া ধাতের লোক?

মাদারীলাল হেসে বলে—তা, আপনারা দু-চারদিনেই জানতে পারবেন। আমি আর কেন নিজ মুখে অভিযোগ করি? শুধু আপনাদের সাবধান করে দিই—এবার থেকে একটু সামলে থাকবেন। লোকটি নিঃসন্দেহে যোগ্য, তবে খুবই রাগী এবং দাম্ভিক। রাগ যেন তার নাকের ডগায় বসে থাকে। নিজে হাজারটা হজম করে ফেলে, সামান্য ঢেকুরও তোলে না; কিন্তু সাহস কি কোন অধীনস্থ কর্মচারী এক কানা কড়ি হজম করে পার পায়! এমন লোকের হাত থেকে একমাত্র ঈশ্বরই রক্ষা করতে পারেন। আমি ভাবছি, ছুটি নিয়ে বাড়ীতে চলে যাই। দু-বেলা তার আস্তানায় হাজির দিতে হবে। মনে রাখবেন, আজ থেকে আপনারা কেউ আর সরকারের চাকর নন, সেক্রেটারী সাহেবের চাকর। কেউ তার ছেলেকে পড়াবে, কেউ বাজার থেকে মালপত্র আনবে, আবার কেউ তাকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাবে। আর চাপরাশিদের সম্ভবতঃ দপ্তরের দর্শনই ঘটবে না।

এইভাবে গোটা দপ্তরকে সুবোধচন্দ্রের বিরুদ্ধে ভড়কানি দিয়ে মাদারীলাল তার কল্‌জে ঠাণ্ডা করে।

॥ ২ ॥

এক সপ্তাহ বাদে সুবোধচন্দ্র গাড়ী থেকে নাবে, স্টেশনে দপ্তরের সমস্ত কর্মচারীদের হাজির দেখে। সকলেই তাকে স্বাগত জানাতে এসেছে। মাদারীলালকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সুবোধ ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে, বলে—তুমি তো আচ্ছা লোক হে! এখানে কিভাবে ? ওহ! আজ এক যুগ পরে দেখা হল।

মাদারীলাল বলে—এখানে জেলা বোর্ড দপ্তরের আমি হেডক্লার্ক। আপনি ভাল আছেন ?

সুবোধ—আমার কথা আর বলো না। বসরা, ফ্রান্স, মিশর—না জানি কোথায়-কোথায় ঘুরে বেড়িয়েছি ? তুমি এই দপ্তরে আছো, খুবই ভাল হয়েছে। আমি তো ভেবে উঠতে পারছিলাম না—কাজ চলবে কি করে। আমি একেবারে কুঁড়ে; তবে যেখানেই যাই, আমার সৌভাগ্যও আমার সঙ্গে সঙ্গে যায়। বসরায় সব অফিসার খুশী ছিল। ফ্রান্সেও বেশ শান্তিতে কাটিয়েছি। দু-বছরে প্রায় হাজার পঁচিশেক টাকা উপার্জন করেছিলাম—সেও উড়িয়েছি। সেখান থেকে ফিরে এসে দিন কয়েক কো-অপারেশন অফিসে ঘোরাঘুরি করে কাটাই। এখানে এসে তোমাকে পেলাম। ( ক্লার্কদের দিকে লক্ষ্য করে ) এঁরা কারা ?

মাদারীর হৃদয়ে বর্শাফলক বিঁধতে থাকে। হতচ্ছাড়া পঁচিশ হাজার টাকা বসরা থেকে উপার্জন করেছে! আর, এখানে আমি কলম পিষে মরে গেছি, অথচ পাঁচশো টাকা এযাবৎ জমা করতে পারিনি। বলে—এরা সকলেই বোর্ডের কর্মচারী। সেলাম জানাতে এসেছে।

সুবোধ তাদের সঙ্গে বার বার করমর্দন করে, বলে—আপনারা

মিছিমিছি কষ্ট করলেন। আমি খুব কৃতজ্ঞ। আশা করি, আপনাদের মত ভদ্রজনের কোন অভিযোগ আমার প্রতি থাকবে না। আমাকে অফিসার ভাববেন না, বরং আপনাদের ভাই বলে মনে করবেন। আপনারা সকলে মিলে এ রকম কাজ করবেন, যাতে বোর্ডের সুনাম অক্ষুন্ন থাকে এবং আমিও যেন প্রশংসা পাই। আপনাদের হেড ক্লার্ক সাহেব আমার পুরনো বন্ধু ও ছেলেবেলাকার সঙ্গী।

একজন বাক্-চতুর ক্লার্ক বলে ওঠে—আমরা হুজুরের তাঁবেদার। যথা-শক্তি আপনাকে অসন্তুষ্ট করবো না; তবে আমরা মানুষ, যদি কোন ভুল-ভ্রান্তি ঘটে, হুজুর যেন ক্ষমা করে দেন।

সুবোধ নম্রভাবে বলে—এটাই আমার সিদ্ধান্ত এবং সর্বদা এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আছি। যেখানেই ছিলাম, অধীনস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করেছি। আমি ও আপনি দুজনেই অন্য কোন তৃতীয় জনের গোলাম। তাহলে এই রোয়াব কিসের, কেনই বা অফিসারী মেজাজ? তবে হ্যাঁ, আমাদের নম্র সদিচ্ছার সঙ্গে নিজের কর্তব্য পালন করা উচিৎ।

॥ ৩ ॥

এক মাস হল সুবোধ এসেছে। এরি মধ্যে বোর্ডের ক্লার্ক, আর্দালি, চাপরাশি সকলেই তার আচার-ব্যবহারে খুশী। কারণ সে এত প্রসন্ন-চিত্ত, এত নম্র, যে-কেউ একবার সাক্ষাৎ করলে চিরদিনের জন্য তার বন্ধু হয়ে পড়ে। কোর রকম কঠোর শব্দ তার মুখ দিয়ে বেরোয় না। অস্বীকারটুকুও সে অপ্রিয় হতে দেয় না, কিন্তু ঈর্ষা-দ্বেষের দৃষ্টিতে যে কোনো গুণ আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। সুবোধের এই সকল যাবতীয় গুণ মাদারীলালের চোখে ভাল লাগে না। তার বিরুদ্ধে কোন-না-কোন গোপন ষড়যন্ত্র করতে থাকে। প্রথমে

কর্মচারীদের লেলিয়ে দিতে চায়, কিন্তু সফল হয় না। বোর্ডের মেম্বারদের ভড়কাতে চায়, তাদের কাছ থেকে উচিৎ জবাব পায়। তারপর ঠিকেদারদের উসকাতে চায়, কিন্তু লজ্জায় পড়তে হয়। মাদারীলাল চাইত, ভূষিতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে দূর থেকে তামাসা দেখে। সুবোধের সঙ্গে সে হেসে-হেসে কথা বলে, ঠাট্টা তামাসা করে যেন তার কত অন্তরঙ্গ বন্ধু ; অথচ ক্ষতি করার জন্য সর্বদা তৎপর। সুবোধের মাঝে সব গুণই ছিল, কিন্তু মানুষ চিনতে জানে না। মাদারীলাল কে সে এখনও নিজের বন্ধু বলে মনে করে।

একদিন, মাদারীলাল সেক্রেটারী সাহেবের ঘরে ঢুকেছে, চেয়ে দেখে তার চেয়ার শূন্য। সম্ভবতঃ কোন কাজে বাইরে গিয়েছে। টেবিলের ওপর হাজার পাঁচেক টাকার নোট বাণ্ডিলে বাঁধা রাখা আছে। বোর্ডের মাদ্রাসার জন্য কিছু কাঠের আসবাব তৈরী করানো হয়েছিল, তারই দাম। ভূগতানের জন্য ঠিকাদারকে ডেকে পাঠিয়েছে। আজই সেক্রেটারী সাহেব চেক পাঠিয়ে ট্রেজারী থেকে টাকা আনিয়েছে। মাদারীলাল বারান্দায় উঁকি দিয়ে দেখে, সুবোধের কোন পাত্তা নেই। তার অভিপ্রায় পালটে যায়। ঈর্ষার সঙ্গে লোভের মিশ্রণ ঘটে। কাঁপা-কাঁপা হাতে বাণ্ডিল তুলে নেয়, পাৎলুনের দুই পকেটে ভরে সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। তারপর চাপরাশিকে ডেকে বলে—সাহেব ভেতরে আছেন ? চাপরাশি আজ ঠিকেদারের কাছ থেকে কিছু পাবার আশায় খুশীতে ডগমগ। সামনে পানের দোকান থেকে ঘুরে এসে বলে—আজ্ঞে না, কাছারীতে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। এইমাত্র গেছেন।

মাদারীলাল দপ্তরে এসে একজন ক্লার্ককে বলে—এই ফাইলটা নিয়ে গিয়ে সেক্রেটারী সাহেবকে দেখাও।

ক্লার্ক ফাইল নিয়ে চলে যায়। একটু পরে ফিরে এসে বলে—সেক্রেটারী সাহেব ঘরে নেই। ফাইল টেবিলে রেখে এসেছি।

মাদারীলাল মুখখানি কুঁচকে বলে—ঘর ছেড়ে কোথায় যে চলে যায় ? কোনদিন না আবার হোঁচট খায়।

ক্লার্ক বলে—দপ্তরের কর্মচারী ছাড়া তার ঘরে আর কারাই বা যায় ?

মাদারীলাল তীব্রস্বরে বলে ওঠে—দপ্তরের লোকেরা সবাই কি দেবতা নাকি ? কখন কার প্রবৃত্তি পাল্টে যায়, কেউ বলতে পারে না। সামান্য টাকা-পয়সার ব্যাপারে আমি অনেক ভাল লোকের প্রবৃত্তি পাল্টাতে দেখেছি। এই সময়ে আমরা সকলেই সাধু ; কিন্তু সুযোগ পেলে অনেকেই হয়তো পাল্টে যায়। মনুষ্যের প্রকৃতিই এই। আপনি গিয়ে তার ঘরের দরজা দুটো বন্ধ করে দিন।

ক্লার্ক এড়িয়ে যেতে চাইল—চাপরাশি বসে আছে দরজার পাশে।

মাদারীলাল বিরক্ত স্বরে বলে—আপনাকে আমি যা বলছি, তা করুন। বলছেন বটে, চাপরাশি বসে আছে। বলি—চাপরাশি কি ঋষি, নাকি মুনী ? চাপরাশিই যদি কিছু সরিয়ে নেয়, আপনি তার কি করবেন ? জামিন যাও বা আছে, তাও তিন'শ টাকার। এখানে এক-একটা কাগজের লাখ টাকা দাম।

এই বলে মাদারীলাল উঠে গিয়ে, দফতরের দরজা দু-দিক থেকে বন্ধ করে দেয়। মন শান্ত হয়ে এলে নোটের বাণ্ডিল পকেট থেকে বার করে একটা আলমারিতে কাগজের তলায় লুকিয়ে রেখে দেয়। তারপর, ফিরে এসে আবার নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

সুবোধচন্দ্র ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে আসে। তখন তার ঘরের দরজা বন্ধ। দপ্তরে ঢুকে হাসতে হাসতে বলে, আমার ঘরের দরজা বন্ধ করেছে কে ভাই, আমারটা কি বেদখল হয়ে গেছে ?

মাদারীলাল দাঁড়িয়ে মৃদু তিরস্কার করে বলে—সাহেব, গোস্তাফী মাফ্ করবেন। আপনি যখনই বাইরে যাবেন—এক মিনিটের জন্যও হোক না কেন—দরজা বন্ধ করে যাবেন। আপনার টেবিলের ওপর টাকা-পয়সা, সরকারী কাগজপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে, কে জানে

কখন কার প্রবৃত্তি পাল্টে যায়। আমি একটু আগে শুনলাম আপনি বাইরে বেরিয়েছেন, তাই দরজা বন্ধ করে দিয়েছি।

সুবোধচন্দ্র দরজা খুলে ঘরের ভেতর ঢোকে, তারপর সিগারেট টানতে থাকে। টেবিলের ওপর নোট রাখা ছিল এ কথাও তার মনে নেই।

সহসা ঠিকেদার এসে সেলাম করে। সুবোধ চেয়ারে উঠে বসে, বলে—তুমি বড্ড দেরী করে ফেলেছো, তোমারই প্রতীক্ষা করছিলাম। দশটার সময়ে টাকা আনিয়ে রেখেছি। রসিদের টিকিট এনেছো ত ?

ঠিকেদার—হুজুর, রসিদ লিখিয়ে এনেছি।

সুবোধ—তাহলে তোমার টাকা নিয়ে যাও। তোমার কাজে আমি মোটেই খুশী নই। তুমি কিন্তু ভাল কাঠ দাওনি, এমন কি কাজও তেমন পরিষ্কার হয়নি। যদি এমন কাজ আবার করো, তাহলে ঠিকেদারের রেজিষ্টার থেকে তোমার নাম কেটে বাদ দিয়ে দেবো।

এই বলে সুবোধ টেবিলে দৃষ্টি ফেলে, নোটের বাণ্ডিল সেখানে নেই। ভাবে, হয়তো কোন কাগজের তলায় চাপা পড়ে আছে। চেয়ারের কাছাকাছি সব কাগজ-পত্র উল্টে-পাল্টে দেখে; কিন্তু নোটের কোন হদিশ নেই। অ্যাঁ! নোট গেল কোথায়! এইতো আমি এখানে রেখেছিলাম। কোথায় যেতে পারে। আবার ফাইল ওল্টাতে থাকে। বুকে সামান্য কাঁপুনি ধরে। টেবিলের সব কটা কাগজ উল্টে-পাল্টে দেখে, বাণ্ডিলের কোন হদিশ নেই। তখন সে চেয়ারে বসে এই আধ ঘণ্টার ঘটনাবলি মনে মনে আলোচনা করতে থাকে—চাপরাশি নোটের বাণ্ডিল এনে আমায় দিল, বেশ মনে আছে। একি ভুলে যাওয়ার ব্যাপার, এত দ্রুত! আমি নোট নিয়ে এই টেবিলের ওপর রেখেছি, গুণেও দেখিনি। তারপর, উকিলবাবু এলেন, পুরনো আলাপ। তার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে ঐ গাছের ধারে গেছি। উনি পান কিনলেন, ব্যস্ এইটুকু যা দেরী হয়েছে। যাবার সময় বাণ্ডিল এখানেই রাখা ছিল। বেশ ভাল মনে আছে। তাহলে

গেল কোথায় ? হয়তো দপ্তরের কেউ সাবধানতার জন্য তুলে রেখে দিয়ে থাকবে ? এটাই সম্ভব। আমি মিছিমিছি এতখানি বিচলিত হয়ে পড়েছি। ছিঃ !

তক্ষুনি দপ্তরে ঢুকে মাদারীলালকে বলে—আপনি আমার টেবিল থেকে টাকাটা তুলে রাখেন নি তো ?

মাদারীলাল ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলে—আপনার টেবিলে কি টাকা রাখা ছিল ? আমি তো জানি না। একটু আগে পণ্ডিত মোহনলাল একটা ফাইল নিয়ে গিয়েছিল তখন আপনাকে ঘরে দেখা যায় নি। আমি যখন জানতে পারলাম আপনি কারো সঙ্গে কথা বলতে গেছেন, তখন দরজা বন্ধ করে দিই। নোট কি পাওয়া যাচ্ছে না ?

সুবোধ চোখ বিস্ফারিত করে বলে—বুঝলেন, পুরো পাঁচ হাজার টাকা। এই মাত্র চেক্ ভাঙ্গিয়ে এনেছি।

মাদারীলাল কপাল চাপড়ে বলে—পাঁচ হাজার ! হে ভগবান ! আপনি ভালো করে টেবিল দেখেছেন তো ?

পনরো মিনিট ধরে খুঁজছি।

চাপরাশিকে জিজ্ঞেস করেছেন কে—কে—এসেছিল ?

আসুন, আপনারাও একটু খোঁজাখুঁজি করুন। আমার মাথার ঠিক নেই এখন।

গোটা দপ্তর সেক্রেটারী সাহেবের ঘর তল্লাসী করতে থাকে। টেবিল, আলমারি, সিন্ধুক সব খোঁজা হয়। রেজিষ্টারের পাতা উল্টে-পাল্টে দেখে ; কিন্তু কোথাও টাকার পাত্তা নেই। কেউ যে চুরি করেছে, এতে আর কোন সন্দেহ নেই। সুবোধ দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তারপর চেয়ারে বসে পড়ে। চোখ মুখের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। মুখ ছোট হয়ে পড়ে। এই সময় তাকে কেউ দেখলে মনে হবে বুঝি মাসাবধি কাল রোগগ্রস্ত।

মাদারীলাল সহানুভূতি দেখিয়ে বলে—আশ্চর্য কাণ্ড ! আজ ওব্দি এমন হয়নি। দশ বছর হলো আমি এখানে কাজ করছি,

কখনো এক টুকরো জিনিষও গায়েব হয়নি। প্রথম দিনেই আমি আপনাকে সাবধান করে দিতে চেয়েছি, টাকা-পয়সার ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকবেন। কিন্তু ভবিতব্য, মনে পড়েনি। নিশ্চয়ই বাইরের কেউ এসেছিল, টাকা নিয়ে পালিয়েছে। চাপরাশির এটাই অপরাধ—সে কাউকে কামরায় ঢুকতে দিয়েছে কেন? সে যদি হাজার বার দিব্যি গালে, বাইরের কেউ আসেনি; আমি তা মানতে রাজী নই। এখান থেকে শুধু পণ্ডিত মোহনলাল ফাইল নিয়ে গিয়েছিল; তা দরজা থেকে উঁকি মেরে ফিরে এসেছে।

মোহনলাল বিহ্বল কণ্ঠে বলে—আমি ঘরের ভেতর পা রাখিনি, স্যার। আমার বড় ছেলের নামে দিব্যি গালছি, আমি ঘরের ভেতর পা রাখিনি।

মাদারীলাল মাথা নেড়ে বলে—আপনি মিছিমিছি দিব্যি গালছেন কেন? কেউ কি আপনাকে কিছু বলেছে? (সুবোধের কানে কানে) ব্যাঙ্কে টাকা থাকলে তা থেকে তুলে ঠিকেদারদের দিয়ে দিন, নইলে দুর্নাম হবে। ক্ষতি যা হবার হয়েছে, তার সঙ্গে অপমান কেন?

সুবোধ করুণস্বরে বলে—ব্যাঙ্কে বড় জোর দু'চার শো টাকা আছে, ভাই! টাকা থাকলে অত চিন্তার কি ছিল। ধরে নিতাম, যেমন পঁচিশ হাজার উড়িয়েছি, না হয় ত্রিশ হাজার উড়বে। এখন আমার কাছে কাফনের জন্যও টাকাকড়ি নেই।

সেই রাত্রেই সুবোধচন্দ্র আত্মহত্যা করে। এত টাকার ব্যবস্থা করা তার পক্ষে কঠিন ছিল। মৃত্যুর পর্দা ছাড়া তার বেদনা, অসহায়ত্ব লুকনোর আর কোন আড়াল ছিল না।

॥ ৪ ॥

পরদিন সকালে চাপরাশি গিয়ে মাদারীলালের বাড়ীতে ডাক

দেয়। মাদারীর চোখে সারারাত ঘুম নামে নি। বিচলিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। চাপরাশি তাকে দেখেই বলে ওঠে—হুজুর! সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেছে, সিকিট্রি সা'ব কাল রাতে গলায় ছোরা বসিয়েছে।

মাদারীলালের চোখ ওপরে উঠে যায়, মুখে কালি ছড়িয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে। মুহূর্তে গোটা শরীর শিউরে ওঠে, যেন তার হাতে বিদ্যুৎ-স্পর্শ করেছে।

ছোরা বসিয়েছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ সকালে জানা গেছে। পুলিশের লোকেরা এসেছে। আপনাকে ডাকছে।

লাশ কি এখনও পড়ে আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ডাক্তারী পরীক্ষা হবে।

অনেক লোকজন কি এসেছে?

সব বড় বড় অফিসার-রা এসেছে। হুজুর, লাশের দিকে আর চেয়ে দেখা যায় না। আহা, কি মানুষ ছিল—একেবারে সাচ্চা। সকলেই কাঁদছে। ছোট ছোট দুটো ছেলে, একটা বড় মেয়ে—বিয়ের যুগ্যি। বৌমাকে সকলেই বাধা দিচ্ছে; তবুও বার বার দৌড়ে লাশের কাছে ছুটে যাচ্ছে। এমন কেউ নেই যে রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে না। এই তো মাসখানেক হলো এসেছে, এরি মধ্যে সকলের সঙ্গে এত আলাপ মেলামেশা—। টাকা-পয়সার কখনও কোন পরোয়া করে নি। মন ছিল সমুদ্রের মত।

মাদারীলালের মাথা ঘুরতে থাকে। দরজার চৌকাট ধরে নিজেকে যদি সামলে না নিত, তাহলে হয়তো পড়ে যেত। জিজ্ঞেস করে—বৌমা বুঝি খুব কাঁদছিল?

'আর জিজ্ঞেস করবেন না, হুজুর। গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়েছে। চোখ ফুলে রক্তজবা হয়ে উঠেছে।

'কটা ছেলেমেয়ে বললে যেন?'

হুজুর, হুটো ছেলে একটা মেয়ে।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, ছেলেদের দেখেছি বটে, মেয়ের বয়স হয়েছে নাকি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বিয়ের যুগ্যি। কেঁদে কেঁদে বেচারীর চোখ ফুলে উঠেছে ?

টাকার ব্যাপারেও কথা উঠেছে নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ, সকলেই বলাবলি করছে দপ্তরের কোন লোকেরই কাজ। দারোগাবাবু সোহনলালকে গেরেপ্তার করতে চাইছিল ; হয়তো আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে করবে। সিকেট্রি সাব লিখে গেছেন কারো ওপর আমার সন্দেহ নেই।

সেক্রেটারী সাহেব কি কোন চিঠি রেখে গেছেন ?

হ্যাঁ, মনে হয় ছোরা বসাবার সময়ে মনে পড়ে থাকবে সকালে দপ্তরের সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে। তাই কালেক্টার সাবের নামে চিঠি লিখে রেখেছে।

চিঠিতে আমার সম্পর্কে কিছু লিখেছে ? তুমি তা কি করে জানবে ?

হুজুর, আমি তার কি জানি, তবে সকলেই বলাবলি করছিল আপনার নাকি খুব প্রশংসা করে লিখেছে।

মাদারীলালের নিঃশ্বাস আরও তীব্র হয়ে ওঠে। চোখ বেয়ে অশ্রুর হুটো বড় বড় ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে। চোখ মুছতে মুছতে বলে —সে আর আমি এক সঙ্গে লেখা-পড়া করেছিলাম, নন্দু। আট দশ বছর এক নাগাড়ে। একই সঙ্গে ওঠা-বসা, একই সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, একই সঙ্গে খেলাধুলা করতাম। এমনভাবে থাকতাম যেন আমরা হুজনে মায়ের পেটের ভাই। চিঠিতে আমার আর কি প্রশংসা করেছে ? তুমি তা কি করে জানবে ?

আপনি যাচ্ছেন, গিয়েই দেখতে পাবেন।

কাফনের ব্যবস্থা হয়েছে ?

না হুজুর, বললাম না এখন লাশ ডাক্তারী পরীক্ষা হবে। বরং

আপনি তাড়াতাড়ি চলুন। পাছে আবার কেউ ডাকতে না আসে।

আমাদের দপ্তরের সকলেই কি হাজির হয়েছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, সকলেই তো এ পাড়ার বাসিন্দা।

পুলিশ কি আমার সম্পর্কে ওদের কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল?

আজ্ঞে না, কাউকে না।

মাদারীলাল সুবোধচন্দ্রের বাড়ীতে হাজির হয়। তার মনে হতে থাকে, সকলেই তার দিকে সন্দেহের চোখে দেখছে। পুলিশ ইন্সপেক্টার তক্ষুনি তাকে ডেকে বলে—আপনার বয়ান লিখিয়ে দিন, সকলেই বয়ান লিখিয়েছে।

মাদারীলাল এমন সাবধানভাবে নিজের বয়ান লেখায় যে পুলিশ অফিসারও বিষম খায়। মাদারীলালের ওপর তার সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু এই বয়ানের ফলে তার অংকুর গজিয়ে ওঠে।

এই সময় সুবোধের দুই ছেলে কাঁদতে কাঁদতে মাদারী-লালের কাছে এগিয়ে যায়, বলে—আপনাকে মা ডাকছে। দুজনেই মাদারীলালের পরিচিত। মাদারীলাল এখানে রোজই আসত; কিন্তু কখনও ঘরে যায় নি। সুবোধের স্ত্রী তার সামনে বেরতো না। এই ডাক শুনে তার বুক কেঁপে ওঠে—যদি আমার ওপর কোন সন্দেহ থাকে। সুবোধ যদি আমার সম্পর্কে কোন সন্দেহ প্রকাশ করে থাকে। কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত, কিছুটা ভীত শঙ্কিত অবস্থায় ভেতরে ঢোকে। বিধবার করুণ বিলাপ শুনে তার বুক কেঁপে ওঠে। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ঐ অবলার চোখ বেয়ে অশ্রুধারা পড়তে শুরু করে, মেয়েটি দৌড়ে এসে তার পা জড়িয়ে ধরে। ছেলে দুটিও তাকে ঘিরে ধরে। ঐ তিন জনের চোখে এত অতল বেদনা, এত মর্মস্পর্শী কাকুতি ফুটে আছে যে মাদারীলালের মনে হয় সে বেশীক্ষণ দেখতে পারে না। তার আত্মা তাকে ধিক্কৃত জানায়। আহা, যে বেচারাদের তার ওপর এত বিশ্বাস, এতখানি

ভরসা, এতদূর আত্মীয়তা, এত ভালবাসার টান ছিল, তাদেরই গলায় কিনা সে ছোরা বসিয়েছে! তারই হাত দিয়ে এই ভরা-সম্পন্ন পরিবার ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে। এই অসহায় প্রাণীদের এখন কি হবে? মেয়েটির বিয়ে দিতে হবে, কে দেবে? ছেলেদের লালন-পালনের ভার কে নেবে? মাদারীলালের মনে এত আত্মগ্লানি হয়, যে তার মুখ থেকে একটিও সান্ত্বনার শব্দ বার হয় না। তার মনে হয়, আমার মুখে কালি ছড়িয়ে পড়েছে, আমার শরীর ছোট হয়ে গেছে। সে যখন টাকা গায়েব করেছিল, বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না তার ফল এ রকম দাড়াবে। সে কেবল সুবোধকে একটু জব্দ করতে চেয়েছিল। তার এমন সর্বনাশ করার ইচ্ছে ছিল না।

শোকাতুর বিধবা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, বলে—দাদা, আমাদের উনি মাঝ নদীতে ফেলে গেলেন। যদি ঘুণাক্ষরে জানা যেত, মনে-মনে উনি এটাই সংকল্প করেছে, তাঁহলে আমার কাছে যা ছিল, সব তাঁর চরণে রেখে দিতাম। আমাকে শুধু এই কথাটা বলেছেন—একটা-না-একটা উপায় বার হবে। আপনার মারফৎ উনি কোনো মহাজন ঠিক করতে চেয়েছিলেন। আপনার ওপর তার যে কতখানি ভরসা ছিল বলা যায় না।

মাদারীলালের মনে হয় কেউ বুঝি তার বুকে ক্ষুর বোলাচ্ছে। গলায় যেন কোন বস্তু আটকে গেছে মনে হয়।

রামেশ্বরী আবার বলে—রাত্রে শুলেন, খুব হাসিখুশী ছিলেন। রোজকারের মত দুধ খেলেন, ছেলেদের আদর করলেন, কিছুক্ষণ হারমোনিয়ম বাজালেন, তারপর মুখ ধুয়ে ঘুমোলেন। এমন কোন অসঙ্গতি ছিল না যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগতে পারে। আমাকে চিন্তিত দেখে বললেন—তুমি মিছিমিছি ঘাবড়াচ্ছো। মাদারীলাল বাবুর সঙ্গে আমার পুরনো বন্ধুত্ব। এই বন্ধুত্ব তাহলে কোন কাজে লাগবে? একসঙ্গে খেলাধুলো করেছি। এই শহরে সকলের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। টাকার ব্যবস্থা সহজেই হবে। তারপর, না-জানি কখন

মনে মনে ঠিক করেছে। হতভাগা আমিও এমন কাল-ঘুম ঘুমিয়েছি যে রাত্রে ভাঙ্গেও নি। কে জানতো তিনি নিজের প্রাণ নিয়ে এমন করে খেলবেন ?

মাদারীলালের চোখে গোটা বিশ্ব যেন সাঁতার কাটতে থাকে। উনি বাধা দেয়ার বহু চেষ্টা করে ; কিন্তু অশ্রুপ্রবাহ থামাতে পারে না।

রামেশ্বরী চোখ মুছে আবার বলে—দাদা' যা ঘটার ঘটে গেছে ; কিন্তু আপনি ঐ দুরাচারের খোঁজ করে বার করুন, যে আমার এমন সর্বনাশটা করল। দপ্তরের কোন লোকেরই এই কাজ। উনি দেবতা ছিলেন। আমাকে শুধু এই বলতে লাগলেন, কারো ওপর আমার কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু দপ্তরেরই কোনো লোক এই কাজ করেছে। আপনার কাছে আমার শুধু এই মিনতি, পাপী যেন পালিয়ে যেতে না পারে। পুলিশেরা হয়তো কিছু ঘুষ খেয়ে ছেড়ে দেবে। আপনাকে দেখে তাদের এই সাহস হবে না। এখন আমাদের মাথার ওপর আপনি ছাড়া আর কে আছে ? কাকেই বা নিজের দুঃখ জানাবো ? লাশের এই দুর্গতি হবে এ যেন নিয়তি।

মাদারীলালের মনে একবার দোলা দিয়ে ওঠে, সে সব কিছু বলে ফেলে। স্পষ্ট বলে দেয় ; আমিই সেই দুষ্ট, সেই অধম, সেই পামর। বিধবার পদতলে পড়ে গিয়ে বলে, সেই ছোরাই এই খুনীর বুকে গেঁথে দাও। কিন্তু কথা বেরোয় না ; এই অবস্থায় বসে-বসে তার মাথা এমন ঘুরে যায় সে মেঝের ওপর পড়ে যায়।

॥ ৫ ॥

তৃতীয় প্রহরে লাশের পরীক্ষা শেষ হয়। মৃতদেহ জলাশয়ের দিকে এগোয়। গোটা দপ্তর, সমস্ত কর্মচারী এবং অসংখ্য লোক

সেই শোক-যাত্রায় চলেছে। দাহ-সংস্কার ছেলেদের করা উচিৎ, কিন্তু ছেলেরা নাবালক। এইজন্য বিধবা স্ত্রী সঙ্গে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিল, এমন সময় মাদারীলাল গিয়ে বলে—বৌমা, এই সংস্কার আমায় করতে দাও। তুমি যদি ক্রিয়াকর্মে বসে পড়, তাহলে ছেলেদের সামলাবে কে। সুবোধ আমার ভাই ছিল। বেঁচে থাকতে তার সঙ্গে কোন সুব্যবহার করা হয়নি, এখন মৃত্যুর পর আমায় কিছু বন্ধুত্বের অধিকার নিতে দাও। তার ওপর আমারও কিছু অধিকার ছিল। রামেশ্বরী কেঁদে ফেলে—ঈশ্বর আপনাকে খুব উদার হৃদয় দিয়েছেন দাদা, নইলে মৃত্যুর পর কে কাকে জিজ্ঞেস করে। দপ্তরের যে সব লোকেরা মাঝরাত ওব্দি হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতো, তারা একবার সান্ত্বনা দিতে খোঁজ করতেও এল না।

মাদারীলাল অবশেষে দাহসংস্কার করে। তের দিন ধরে অশৌচ ক্রিয়ায় বসে। তের দিনেই পিণ্ডদান হয়; ব্রাহ্মণেরা ভোজন করে, ভিখিরীদের অন্নদান করা হয়, বন্ধুদের নিমন্ত্রণ জানায়—সব কিছু মাদারীলাল স্বখরচে করে। রামেশ্বরী বার বার বলে, আপনি যা করছেন সেটাই অনেক বেশী। আপনাকে আর জেরবার করতে চাই না আমি। বন্ধুত্বের অধিকার এর চেয়ে বেশী আর কে টানে। কিন্তু মাদারীলাল কোন কথা শোনে না। গোটা শহরে তার যশ ছড়িয়ে পড়ে, প্রকৃত বন্ধু এরকম হওয়াই উচিৎ।

ষোল দিনের দিনে রামেশ্বরী মাদারীলালকে বলে—দাদা, আপনি আমাদের যা উপকার ও অনুগ্রহ করেছেন, আমৃতু সেই ঋণ আমরা শোধ করতে পারবো না। আপনি যদি পেছনে এসে না দাঁড়াতেন, তাহলে কি-জানি আমাদের কি যে গতি হতো। মাথার ওপর কোন ছাদ ছিল না। এখন আমাদের দেশের বাড়ীতে যেতে দিন। গাঁয়ে খরচ-পাতি কম হবে, তাছাড়া চাষ বাসের একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারবো। কোন রকমে এই দুর্দিন কেটেই যাবে! আমাদের এরকম অনুগ্রহ করবেন।

মাদারীলাল জিজ্ঞেস করে—দেশে কিরকম সম্পত্তি আছে ?

রামেশ্বরী—সম্পত্তি আর কি, একটা কাঁচা বাড়ী আর দশ বারো বিঘের চাষবাস। পাকাবাড়ী তৈরী করতে শুরু করেছিল, কিন্তু টাকা জোগাড় হয়ে ওঠেনি। এখনও অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। হাজার দশ-বারো খরচ হয়ে গেছে, অথচ ছাদ ফেলার মত এখনও হয়ে ওঠেনি।

মাদারীলাল—টাকা-পয়সা কিছু ব্যাঙ্কে জমা আছে ? নাকি শুধু চাষ বাসের ওপর নির্ভর করতে হবে ?

রামেশ্বরী—জমা এক পয়সাও নেই দাদা! ওনার হাতে টাকা মোটেই থাকতো না। এখন শুধু চাষবাস-ই একমাত্র সম্বল।

মাদারী—চাষবাসে কেমন ফসল হয়, যা দিয়ে খাজনা শোধ করে তোমাদের দিন চলবে ?

রামেশ্বরী—এ ছাড়া আর কি করার আছে, দাদা। কোন রকমে দিন কাটাতে হবে। ছেলেপেলে না থাকলে বিষ খেতাম।

মাদারী—মেয়ের বিয়েও যে তোমায় দিতে হবে ?

রামেশ্বরী—ওর বিয়ের এখন কোন চিন্তা নেই। আমাদের পরিবারে এমন অনেক ঘর পাওয়া যাবে, যারা দেনা-পাওনা ছাড়া বিয়ে করে নেবে।

মাদারীলাল কিছুক্ষণ ভেবে বলে—আমি যদি কিছু পরামর্শ দিই, তুমি রাজী হবে ?

রামেশ্বরী—দাদা, আপনার পরামর্শে রাজী না হলে কার পরামর্শে রাজী হবো ? তাছাড়া আমার আছেই বা কে ?

মাদারী—তাহলে তুমি দেশে যাবার পরিবর্তে আমার বাড়ীতে চলো। আমার ছেলেমেয়ে সংসার যেমন আছে, তুমিও তেমন থাকবে। ঈশ্বর মুখ চাইলে কন্যার বিবাহও সদবংশে হবে।

বিধবার চোখ সজল হয়ে ওঠে। বলে—কিন্তু দাদা, ভেবে দেখুন······মাদারীলাল কথা থামিয়ে বলে ওঠে—আমি কিছু

ভাববো না, কোন ওজর আপত্তিও শুনবো না। দু-ভাইয়ের সংসার কি একসঙ্গে থাকে না? সুবোধকে আমি ভাই মনে করতাম, চিরদিন তাই মনে করবো।

বিধবার কোন ওজর শোনা হয় না। মাদারীলাল সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। আজ দশ বছর ধরে তাদের প্রতিপালন করছে। ছেলে দুটি এখন কলেজে পড়ে, কন্যাটির বিয়ে হয়েছে একটি প্রতিষ্ঠিত বংশে। মাদারীলাল এবং তার স্ত্রী মনেপ্রাণে রামেশ্বরীর সেবা করে এবং তার নির্দেশমত কাজ করে। মাদারীলাল সেবা করে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে।

## সদ্‌গতি

দুঃখী চামার দোরগোড়ায় ঝাঁট দিচ্ছিল, বৌ ঝুরিয়া গোবর দিয়ে ঘর নিকোচ্ছিল। দুজনে আপন-আপন কাজ থেকে ফুরসত পাবার পর, চামারনি বলে—এখনই গিয়ে ঠাকুর মশাইকে বলে এসো। শেষে না আবার কোথাও বেরিয়ে পড়েন।

দুখী—যাচ্ছি; কিন্তু ভেবে দ্যাখ, উনি বসবেন কিসে?

ঝুরিয়া—কোথাও কি খাটিয়া পাওয়া যাবে না? ঠাকুরানীর কাছ থেকে চেয়ে আনিস।

দুখী—তুই মাঝে-মাঝে এমন কথা বলিস যে সর্বাঙ্গে আগুন ধরে ওঠে। ঠাকুরাণী আমায় খাটিয়া দেবে—তাহলেই হয়েছে। বলে আগুন পর্যন্ত ঘর থেকে বার করেন না, উনি দেবেন খাটিয়া। কুঁয়োর পাড়ে গিয়ে এক ঘটি জল চাইলে পাওয়া যায় না। খাটিয়া আর কে দেবে। একি আমাদের পাথর কড়ি ভূষি কাঠ—যে ইচ্ছে তুলে নিয়ে যাবে। যা, নিজের খাটলি ধুয়ে রেখে দে। গরম কাল। ওনার আসতে আসতে শুকিয়ে যাবে।

ঝুরিয়া—উনি আমাদের খাটলির ওপর বসবেন না। চোখে দেখো না, উনি কেমন শুদ্ধ-পবিত্র থাকেন।

তুখী কিছুটা চিন্তিত হয়ে বলে—হ্যাঁ, এ একটা কথা বটে। মহুয়ার পাতা ছিঁড়ে একটা গোলপাতা আসন করে নিলে ঠিক হয়। পাতায় বড় বড় লোকেরা খায় দায়। পবিত্র জিনিষ। যা, লাঠি নিয়ে আয় তো, কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে দিই।

ঝুরিয়া—আসন আমি বানিয়ে নেবো। তুমি যাও, হ্যাঁ, ওনাকে সিধেও যে দিতে হবে। আমাদের থালায় সাজিয়ে রাখি।

তুখী—হাঁ হাঁ ভুলেও এমন কাণ্ড করিস না, নইলে সিধেও যাবে, থালাও ভাঙ্গবে। ঠাকুর মশায় থালা তুলে আছড়ে ফেলবে। ওনার আবার বড় তাড়াতাড়ি ক্রোধ হয়। ক্রোধে পণ্ডিতানীকেও ছাড়েন না, ছেলেকে এমন মেরেছেন, আজও ভাঙ্গা হাত নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ···পাতায় করেই সিধে দিস হাঁ। খবরদার, তুই কিন্তু ছুবি না। গোঁড়ের* মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বেনের দোকান থেকে সব জিনিস আনিস। সিধে যেন পুরোপুরি থাকে। এক সের আটা, আধসের চাল, এক পো ডাল, আধ পো ঘি, নুন, হলুদ আর পাতার এক কোণে চার আনা পয়সা রেখে দিস। গোঁড়ের মেয়েকে না পেলে অন্য কারোর হাত-পা ধরে নিয়ে যাস। খবরদার, তুই কিন্তু ছুবি না, তাহলে অনর্থ বাঁধবে।

এইসব তাগাদা দিয়ে তুখী কাঠ তোলে, তারপর ঘাসের একটা বড় গাঁট নিয়ে ঠাকুর মশাইকে নিবেদন করতে যায়। খালি হাতে ঠাকুরের সেবা কি হয়। নজরানার জন্য তুখীর কাছে ঘাস ছাড়া আছেই বা কি। খালি হাতে ওকে দেখলে ঠাকুর মশাই দূর থেকেই দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে।

---

* গোঁড় মধ্যপ্রদেশের এক জন-জাতি।

॥ ২ ॥

পণ্ডিত ঘাসীরাম ঈশ্বরের পরমভক্ত। ঘুম ভাঙ্গার পর থেকে ঈশ্বরোপাসনায় মগ্ন হন। হাত-মুখ ধুতে-ধুতে আটটা বেজে যায়। তারপর পূজো শুরু হয়—যার প্রথম পর্যায় হলো সিদ্ধির প্রস্তুতি। তারপর আধঘণ্টা ধরে চন্দন ঘষেন, আয়নার সুমুখে বসে একটা কাঠি দিয়ে কপালে তিলক কাটেন। চন্দনের দুই রেখার মাঝে লাল মাটির টিপ পড়েন। পরে, বক্ষ মাঝে বাহুতে চন্দনের গোল গোল মুদ্রিকা আঁকেন। তারপর ঠাকুর মূর্তি বার করে স্নান করান, চন্দন আঁকেন, পুষ্পসজ্জা করেন, আরতি করেন, ঘণ্টা বাজান। দশটা বাজতে বাজতে উনি পূজো সেরে ওঠেন, তখন সিদ্ধি খেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। ততক্ষণে দু-চারজন যজমান দরজায় এসে হাজির হয়। ঈশ্বরোপসনার ফললাভ তৎক্ষণাৎ পেয়ে যান।

আজ তিনি পূজাগৃহ থেকে বেরোতেই দেখেন, দুখীচামার ঘাসের একটা গাঁট নিয়ে বসে আছে। দুখী তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়, তারপর সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। তাঁর তেজস্বী মূর্তি দেখে দুখীর হৃদয় শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কি অনন্যসাধারণ দিব্য মূর্তি। ছোটখাট নাদুস-নুদুস মানুষ, প্রশস্ত ললাট, মাংসল গাল, ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত চোক্ষু দুটি। মেটে সিঁদূর ও চন্দন দৈব-প্রতিভা প্রদান করছিল। দুখীকে দেখে শ্রীমুখ থেকে বাণী নিঃসৃত হয়--আজ কি ভেবে এলিরে দুখীয়া?

দুখী মাথা নীচু করে বলে—বেটির বিয়ে দিচ্ছি ঠাকুর। একটা শুভ দিনক্ষণ দেখে দিন। কখন ইচ্ছে হবে?

ঘাসী—আজ আমার ছুটি নেই। ঠিক আছে, সাঁঝের বেলায় যাবো।

দুখী—না ঠাকুর, একটু তাড়াতাড়ি ইচ্ছে করেন। সব যোগাড়-যন্তর করে এসেছি। এই ঘাসগুলি কোথায় রাখি?

ঘাসী—এই গরুটার সামনে রেখে দে, আর ঐ ঝাঁটাটা দিয়ে দোরগোড়া পরিষ্কার করে দে। এই মণ্ডপটাও কদিন ধরে নিকানো হয়নি। ওটাও গোবর দিয়ে নিকিয়ে দে। ততক্ষণে আমি খাওয়া সেরে নিই। তারপর একটু বিশ্রাম করে যাবো। আর হ্যাঁ, এই কাঠটাও চিরে রাখিস। গোয়ালঘরে চার ঝাড়ু ভুষি পড়ে আছে। ওটাও তুলে আনিস্, এনে মড়াইয়ে রেখে দিস।

দুখী সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তালিম করতে শুরু করে। দোরগোড়ায় ঝাঁট দেয়, মণ্ডপে গোবর দিয়ে নিকোয়। ততক্ষণে বারোটা বাজে। পণ্ডিত মশাই ভোজন করতে চলে যান। দুখী সকাল থেকে কিছুই খায়নি। তারও খুব জোরে ক্ষিধে পেতে থাকে; কিন্তু, এখানে তার কিই বা খাবার রাখা আছে। এখান থেকে বাসা প্রায় মাইল-খানেক। সেখানে খেতে গেলে, পণ্ডিত মশায় যদি রেগে ওঠেন। বেচারা ক্ষিধে চেপে কাঠ চিরতে থাকে। বেশ মোটা কাঠের গুড়ি, এর আগে ঘাসীরামের বহু ভক্ত নিজ-নিজ শক্তি পরীক্ষা করেছে। অথচ সে কিনা ঐ ক্লান্ত ক্ষিধে শরীরে ভারি পরিশ্রম করতে চাইছে। দুখী সাধারণতঃ ঘাস কেটে বাজারে নিয়ে যায়—কাঠ চেরার কোন অভ্যেস নেই। ওর খুরপির সামনে ঘাস মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়। শক্ত হাতে সে এখন কুড়ুল চালায়, কিন্তু কাঠের গুড়িতে কোন আঁচড় পড়ে না। বরং কুড়ুল ফস্‌কে যায়। ঘামে তার শরীর ভিজে ওঠে, হাঁপাতে থাকে, শ্রান্ত হয়ে বসে পড়ে। আবার উঠে দাঁড়ায়; কিন্তু হাত তুলতে পারে না, পা কাঁপতে থাকে, কোমর সোজা করতে পারে না, চোখের সামনে অন্ধকার। মাথা ঘুরতে থাকে, একরাশ পতঙ্গ চোখের সামনে উড়তে থাকে, তবুও নিজের কাজ করে চলে। যদি এ সময় এক ছিলিম তামাক পাওয়া যেত, তাহলে হয়তো কিছুটা শক্তি পেত সেভাবে। কিন্তু, এখানে ছিলিম আর তামাক পাবে কোত্থেকে।

বামুনদের পাড়া। বামুনরা কি আমাদের মত, নীচু জাতের লোকদের মত তামাক খায়! সহসা তার মনে পড়ে, গাঁয়ে এক ঘর গোঁড় জাতি বাস করে। তার কাছে নিশ্চয় কলকে-তামাক হবে। অবিলম্বে তার বাড়ীতে দৌড়ে যায়। যাক্ পরিশ্রম সার্থক। কে তামাক এগিয়ে দেয়, কলকেও; কিন্তু আগুন নেই। দুখী বলে—আগুনের জন্য ভেবো না। আমি যাচ্ছি পণ্ডিত মশায়ের ঘর থেকে চেয়ে নেবো। সেখানে কিছুক্ষণ আগেও রান্না হচ্ছিল।

এই বলে সে ঐ-দুটো জিনিষ সঙ্গে করে নিয়ে আসে। পণ্ডিত মশায়ের ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বলে—কর্তাঠাকুর, একটু আগুন পাই, তাহলে ছিলিম টানি।

পণ্ডিত মশায় খাচ্ছিলেন। পণ্ডিত গিন্নী জিজ্ঞেস করেন—লোকটা কে আগুন চাইছে?

পণ্ডিত—ওই হতচ্ছাড়া দুখিয়া চামার। বলেছি, একটু কাঠ চিরে দিতে। তা, আগুন থাকলে ওকে দাও।

পণ্ডিত-গিন্নী ভ্রূ তুলে বলেন—তোমার যত্তো কাণ্ড; পুঁথিপত্র পড়ে ধম্ম-কম্মো সম্পর্কে সব বোধবিচার খুয়ে বসে আছো। চামার ধোপা নাপিত যে কেউ মুখ তুলে সোজা ঘরে চলে আসে। হিঁদুর ঘর তো নয়, যেন সরাইখানা। বলে দাও মুখপোড়া মিন্‌সেকে চলে যেতে, নইলে এই চ্যালা কাঠে ওর মুখ পুড়িয়ে দোবো। হুঁ, আগুন চাইতে এসেছে।

পণ্ডিত মশায় তাকে বুঝিয়ে বলেন—ভেতরে এসেছে, তাতে কি হয়েছে। তোমার কোন জিনিষ ছোঁয়নি তো। মাটি পবিত্র জিনিষ। সামান্য একটু আগুন দিয়ে দাও না কেন, আমাদেরই ত কাজ করছে। কোন কাঠুরেকে দিয়ে এই কাঠ চেরাতে, কম করেও চার গণ্ডা পয়সা নিত।

পণ্ডিত গিন্নী গর্জে ওঠেন—তা বলে ঘরে ঢুকবে?

পণ্ডিত মশায় হেরে গিয়ে বলেন—ব্যাটার মন্দ ভাগ্য, তাছাড়া

আর কি বলবো ?

পণ্ডিত গিন্নী—ঠিক আছে, এবারকার মত আগুন দিয়ে দিচ্ছি ; কিন্তু এরপর যদি এভাবে কেউ ঘরে ঢোকে তাহলে তার মুখ পুড়িয়ে ছাড়বো।

দুখীর কানে এসব কথা যায়। আফশোস করছিল, না-হয় সে এসেছে। সত্যি কথাই বলেছে। পণ্ডিতের ঘরে চামার ঢোকে কি করে। ওঁরা বড় পবিত্র লোক, তাইতো পৃথিমশুদ্ধ ওঁদের বড় মান্য করেন, তাইতো ওঁদের এত সম্মান। চামার বৈ তো নই। এই গাঁয়েই এতটা বয়স গেলো, অথচ আমার এতটুকু বুদ্ধিশুদ্ধি হলো না।

পণ্ডিত-গিন্নী যখন আগুন নিয়ে বাইরে আসেন, সে যেন স্বর্গের বর পেল। দু-হাতে জোড় করে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বলে—গিন্নী-মা, আমার ভয়ানক ভুল হয়েছে আমি ঘরে ঢুকে পড়েছি। চামারের বুদ্ধি আর কত হবে। মুখ্যু না হলে এত লাথি-ঝাঁটা খাবো কেন। পণ্ডিত-গিন্নী চিমটে ধরে আগুন ছুঁড়ে ফেলেন। আগুনের একটা বড় টুকরো দুখীর মাথার ওপর গিয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি পেছনে সরে মাথা ঝাড়তে থাকে। তার মন বলে ওঠে—পবিত্র বামুনের ঘর অপবিত্র করার ফল। ভগবান সত্যি কত তাড়াতাড়ি হাতে-নাতে ফল দিলেন। এই জন্যই পৃথিমী পণ্ডিতদের বড় ডরায়। আর সকলের টাকা-পয়সা মার যায়, কিন্তু বামুনের টাকা-পয়সা কেউ মারতে পারে না। বাড়ী-ঘর ছারখার হয়ে পড়বে, পা গলে-পচে ঝরে পড়বে যে।

বাইরে এসে সে ছিলিম টানে, তারপর কুড়ুল নিয়ে আবার কাজে লাগে। খট্ খট্ শব্দ হতে থাকে।

ওর মাথায় আগুন পড়ার ফলে, পণ্ডিত-গিন্নীর মনে ওর প্রতি কিছুটা দয়া জাগে। পণ্ডিত মশায় খেয়ে ওঠার পর, তাঁকে বলেন—ওই চামারটাকেও কিছু খেতে দাও, বেচারা অনেকক্ষণ ধরে কাজ করছে। অভুক্তই আছে।

পণ্ডিত মশাই এই প্রস্তাব দৃষ্টিকোণে বুঝে ফেলে ; জিজ্ঞেস করে—রুটি আছে ?

পণ্ডিত-গিন্নী—তু-চারখানি থাকতে পারে।

পণ্ডিত—তু-চারখানি রুটিতে কি আর হবে ? ব্যাটা চামার, কম করেও এক সের খেয়ে ফেলবে।

পণ্ডিত-গিন্নী কানে হাত চেপে বলেন—ওমা! এক সের! তাহলে থাকুক গে।

পণ্ডিত মশাই এবার বাঘ হয়ে বলেন—কিছু ভূষি-খোসা থাকলে আটায় মিশিয়ে তুটো লিট্টি গড়ে দাও। শালার পেট ভরবে। পাতলা রুটিতে এই ছোটজাতদের পেট ভরে না। এ ব্যাটাদের জোয়ার-এর লিট্টি দরকার।

পণ্ডিত-গিন্নী জবাব দেন—বাদ দাও এখন, কে আর গরমে খাটবে।

তুখী তামাক টেনে আবার কুড়ুল ধরে। ছিলিম টানার পর হাতে শক্তি পায়। আধ ঘণ্টা ধরে আবার কুড়ুল চালায়। তারপর কাহিল হয়ে সেখানে মাথা ধরে বসে পড়ে।

এরি মধ্যে গোঁড় আসে। বলে—কেন মিছিমিছি জানটা দিচ্ছ বুড়ো দাতু, তোমার কুড়ুলের চোটে এই গুঁড়ি ফাটবে না। এমনি খেটে মরবে।

তুখী মাথার ঘাম মুছে বলে—এখনও এক গাড়ী ভূষি বইতে হবে ভাই!

গোঁড়—বলি, খাবার-টাবার দিয়েছে, নাকি শুধু কাজ করাচ্ছে! গিয়ে চাইছো না কেন ?

দুখী—কি কথা বলছো তুমি, বামুনের রুটি কি আমার হজম হবে ?

গোঁড়—হজমের জিনিষ হলে হজম হবেই ; আগে খাবার পাও, নিজে তো বেশ গোঁফে তা' দিয়ে খেল, তারপর আরামে ঘুমোচ্ছে। এদিকে তোমাকে কাঠ চিরতে হুকুম দিয়ে গেছে। জমিদারও কিছু খেতে দেয়। হাকিমও বেগার নিলে, কিছু বেশী মজুরী দেয়। উনি ওঁদের চেয়েও এক কাঠি এগিয়ে গেছেন, তার ওপর আবার ধার্মিক সাজেন।

দুখী—আস্তে বলো ভাই, যদি শুনতে পায়, তাহলে ঝামেলা বাধবে।

এই বলে দুখী আবার সামলে ওঠে, কুড়ুল দিয়ে কাঠে চোট মারতে থাকে। গোঁড়ের তার প্রতি দয়া হয়। এদিকে এসে তার হাত থেকে কুড়ুল কেড়ে নেয়, তারপর আধঘণ্টাটাক বেশ জোরে-জোরে কুড়ুল চালায় ; তবুও গুড়িতে সামান্য ফাটল দেখা দেয় না। তখন সে কুড়ুল ছুঁড়ে ফেলে, তারপর এই বলে ফিরে যায়—তোমার কুড়ুলে এই কাঠ একটুও চিরবে না, জান বেরিয়ে যাক, তবুও।

দুখী ভাবতে বসে, ঠাকুরমশাই এই গুড়ি কোথায় ফেলে রেখেছিল যে একটুও চিড় খায় না। কোথাও ফাটল পর্যন্ত হয় না। আমি আর কতক্ষণ ধরে এটা চিরবো। এদিকে ঘরে হাজারটা কাজ পড়ে আছে। কাজকর্মের ঘর, একটা-না-একটা জিনিষের অভাব লেগেই থাকে ; কিন্তু এর কি কোন চিন্তা আছে। থাক, বরং ভূষি তুলে এনে রাখি। বলে দেবো, ঠাকুর, আজ কাঠ চেরে নাই, কাল এসে চিরে দেবো।

সে ঝুড়ি তোলে, তারপর ভূষি বইতে শুরু করে। খামার এখান থেকে দুই ফার্লং-এর কম নয়। ঝুড়িটাকে যদি ঠেসে-ঠুসে ভরে আনে, তাহলে কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ হয় ; কিন্তু ঝুড়ি মাথায় তুলে দেবে কে ? ভরা ঝুড়ি একা তার দ্বারা তোলা যাবে না। এইজন্য একটু একটু করে আনে। চারটে নাগাদ ভূষি শেষ হয়। পণ্ডিত মশায়ের

ঘুম ভাঙ্গে। মুখ-হাত ধোন, পান খান, তারপর বাইরে বের হন। দেখেন, দুখী তখন ঝুড়ির ওপর মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। জোর গলায় ডেকে ওঠেন—অ্যাই, দুখিয়া, ঘুমোচ্ছিস যে? কাঠ এখনও যেমন-কে তেমন পড়ে রয়েছে। এতক্ষণ ধরে তুই কি করছিলি? এক মুঠো ভূষি তুলতেই সাঁঝ করে দিলি। তার ওপর তুই কিনা ঘুমোচ্ছিস! এইনে, কুড়ুল তোল, যা কাঠটাকে চিরে ফেল। তোর দ্বারা এই সামান্য কাঠ কাটে না। বুঝলি, দিনক্ষণও সে রকমই বেরোবে, আমায় তখন দোষ দিবি না। এই জন্যেই বলে, ছোটজাতের ঘরে খাবার জুটলেই চোখের নজর পাল্টে যায়।

দুখী আবার কুড়ুল তোলে। যে সব কথা ভেবে রেখেছিল, সব ভুলে যায়। পিঠের সঙ্গে পেট একেবারে লেপটে গেছে, আজ সকালেও কিছু খাওয়া হয়নি। অবকাশ পায় নি। এখন উঠে দাঁড়ানো তার কাছে পাহাড়-সমান লাগছে। মন একেবারে কুঁকড়ে গেছে; তবুও সে নিজেকে বুঝিয়ে কোন রকমে উঠে দাঁড়ায়। পণ্ডিত মানুষ যদি দিনক্ষণ ঠিক করে বিচার না করেন, তাহলে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাই তো সংসারে এত মান। গ্রহ-রাশিরই তো সব খেলা। যাকে ইচ্ছে সর্বনাশ করে দেয়। পণ্ডিত মশায় কাঠের গুড়ির কাছে এসে দাঁড়ান, এবং উৎসাহ দিতে থাকেন—হ্যাঁ, কষে মার, আরো জোরে—জোরে মার—ওরে জোরে মার—তোর হাতে যেন শক্তিই নেই—কষে মার না, দাঁড়িয়ে ভাবছিস কি—হ্যাঁ—এই চিরলো বলে। দে ওই ফাঁকে।

দুখীর নিজের হুঁশ নেই। কে জানে কোন এক অদৃশ্য শক্তি তার হাত চালাতে থাকে। সেই ক্লান্তি, ক্ষুধা, দুর্বলতা সব যেন হারিয়ে যায়। তার নিজের বাহুবল সম্পর্কে সে নিজেই আশ্চর্য বোধ করে। এক-একটা চোট বজ্রের মত এসে পড়ে। আধ ঘণ্টা ধরে সে এই রকম উন্মাদের মত হাত চালাতে থাকে, শেষাবধি কাঠ মাঝখান থেকে ফেটে যায়—সঙ্গে সঙ্গে দুখীর হাত থেকে সহসা কুড়ুল ছিটকে

পড়ে যায়। সেও মাথা ঘুরে পড়ে যায় মাটিতে। ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, ক্লান্ত শরীর জবাব দিয়ে দেয়।

পণ্ডিত মশাই ডাকেন—উঠে দু-চারটা ঘা আরও দে। ছোটখাট চ্যালা কাঠ করে দে। কিন্তু, দুখী ওঠে না। তাকে আর বিরক্ত করা উচিৎ মনে করেন না তিনি। পণ্ডিত মশায় ভেতরে গিয়ে সিদ্ধি বাটেন, শৌচে যান, স্নান করেন এবং পণ্ডিতী-পিরান পরে বাইরে আসেন। দুখী এখনও সেখানেই পড়ে আছে। জোর গলায় ডাকেন—ওরে এখনও কি পড়ে থাকবি দুখী, চল তোর বাড়ীতে যাই। সব জিনিষ-পত্তর ঠিক-ঠাক আছে তো? দুখী তবুও ওঠে না।

এবার পণ্ডিত মশায়ের কিছুটা শংকা জাগে। কাছে, গিয়ে দেখেন, দুখী কুঁকড়ে পড়ে আছে। আতঙ্কিত হয়ে দৌড়ে পালান, পণ্ডিত-গিন্নীকে বলেন—শোনো, দুখিয়া বুঝি মরে গেছে।

পণ্ডিত-গিন্নী ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলেন—অ্যা, ও তো এই মাত্র কাঠ চিরছিল।

পণ্ডিত—হ্যাঁ, কাঠ চিরতে-চিরতে মরে গেছে। কি হবে এবার?

পণ্ডিত-গিন্নী শান্ত হয়ে বলেন—হবে আবার কি? চামার পাড়ায় বলে পাঠাও, মড়া তুলে নিয়ে যাক।

মুহূর্তে গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়ে। এলাকাটা ব্রাহ্মণদের ঘর-বসতি। শুধু এক ঘর গোঁড়ের বাস; ওদিককার পথে যাতায়াত সকলেই বন্ধ করে। অথচ, কুঁয়োয় যাবার পথ ওদিকেই, জল আনবে কি করে। চামারের লাশ ঘেঁষে ঐ পথে জল ভরতে যাবে কে? গিয়ে বলে—মড়া তোলার ব্যবস্থা করছো না কেন? গাঁয়ের লোকেরা কি জল খাবে না?

এদিকে গোঁড় চামার পাড়ায় গিয়ে সবাইকে বলে—খবরদার, মড়া তুলতে যেও না। পুলিশের তল্লাশি এখনও বাকী। ঠাট্টা নাকি, একজন গরীবের প্রাণ নেবে। উনি পণ্ডিত, তা নিজের বাড়ীতে। লাশ তুলতে গেলে তোমাদের কেও ধরে নিয়ে যাবে।

এর পরেই পণ্ডিত মশায় সেখানে গিয়ে হাজির হন; কিন্তু চামারদের মধ্যে কেউ লাশ তোলার জন্য রাজী হয় না। শুধু, দুখীর বউ ও মেয়ে দুজনে হায়-হায় করতে করতে করতে সেখানে যায়, এবং পণ্ডিত মশায়ের বাড়ীর দরজায় মাথা ঠুকে ঠুকে কাঁদতে থাকে। সঙ্গে আরও দশ-পাঁচজন চামারনি ছিল। কেউ কাঁদে, কেউ বোঝায়,—কিন্তু একটাও চামার সঙ্গে নেই। এদিকে পণ্ডিত মশায় চামারদের কড়া করে ধমক্ দেন, বোঝান, অনুরোধ করেন, কিন্তু চামারদের মনে পুলিশী-আতঙ্ক ছেয়ে ছিল, একজনও এগিয়ে আসে না, অবশেষে নিরাশ হয়ে ফিরে যান।

॥ ৪ ॥

মাঝরাত পর্যন্ত কান্নাকাটি চলতে থাকে। দেবতাদের ঘুমনো অসম্ভব হয়ে ওঠে; কিন্তু লাশ তুলতে কোন চামার আসে না; ব্রাহ্মণ চামারের লাশ তোলে কি করে! এমন কথা কি কোন শাস্ত্র-পুরাণে লেখা আছে? কেউ দেখিয়ে দিক তো!

পণ্ডিত-গিন্নী ঝাঁঝালো স্বরে বলেন—এই ডাইনিগুলো এসে আমার মাথা খেয়ে ফেলছে। বাব্বা, ওদের গলাও বসে না।

পণ্ডিত বলেন—কাঁদতে দাও পেত্নিগুলোকে, কতক্ষণ আর কাঁদবে। বেঁচে থাকতে, কেউ খোঁজ খবর নিত না। যেই মরেছে, অমনি চেঁচামেচি করতে সবকটা এসে হাজির।

পণ্ডিত-গিন্নী—চামারদের কান্না অশুভ।

পণ্ডিত—হ্যাঁ, বড় অশুভ।

পণ্ডিত-গিন্নী—এখন থেকে দুর্গন্ধ বেরোতে শুরু করেছে।

পণ্ডিত—করবে না! ব্যাটা যে চামার ছিল। খাদ্য-অখাদ্যের কোন বাদ-বিচার আছে নাকি এদের।

পণ্ডিত-গিন্নী—ঘৃণা-বাস বলেও এদের কিছু নেই।

পণ্ডিত—সব কটা ভ্রষ্ট।

. রাতটা কোন রকমে কাটে, সকালেও কোন চামার আসে না। চামারনিরাও কেঁদে-কেটে ফিরে যায়। দুর্গন্ধ একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ে।

পণ্ডিত মশায় একটা দড়ি বার করেন। ফাঁস তৈরী করে মড়ার পায়ে রাখেন, তারপর টেনে শক্ত করে দেন। মড়া এখনও কিছুটা শক্ত আছে। পণ্ডিত মশায় দড়ি ধরে লাশ হেঁচড়ে টানতে থাকেন, তারপর গাঁয়ের বাইরে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যান। সেখান থেকে ফিরে এসে অবিলম্বে স্নান করেন, দূর্গা স্তোত্র পাঠ করেন এবং বাড়ীর সর্বত্র গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেন।

ওদিকে দুখীর লাশ ক্ষেতে শেয়াল, শকুন, কুকুর এবং কাক ছিঁড়ে খায়। আজীবন ভক্তি, সেবা এবং নিষ্ঠার এই পরিণতি।

## প্রেমের উদয়

ভোঁদু ঘামে জবজবে শরীরে কাঠের একটা গাঁট মাথায় করে আনে, এবং তা মাটির ওপর আছড়ে ফেলে বন্টির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, যেন জিজ্ঞেস করে—এখনও তোর মেজাজ ঠিক হয় নি ?

সন্ধ্যে হয়ে গেছে, তবুও লু' বইছিল এবং আকাশে ধুলো ছেয়ে আছে। প্রকৃতি রক্ত-শূন্য দেহের মত শিথিল হয়ে উঠেছে।

সেই সকালে ভোঁদু ঘর থেকে বেরিয়েছে। দুপুর কাটিয়েছে সে একটা গাছের ছায়ায়। ভেবেছিল—এই তপস্যায় দেবীর মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠবে ; কিন্তু ফিরে এসে দেখে, সে এখনও 'গোঁসা-ঘরে' আছে।

ভোঁদু কথা শুরু করার অছিলায় বলে—দে, এক ঘটি জল দে, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। সারাটা দিন বাজে গেছে। বাজারে গেলে

তিন আনার বেশী পাবো না। দু-চারটে নেউল পেলেও পরিশ্রম সার্থক হতো।

বন্টি ছাউনির ভেতর বসে বসেই বলে—ধম্মোও যাবে, পয়সাও পাবে না। বলি, মুখ ধুয়ে বসে থাকো।

ভোঁদু ভ্রূ কুঁচকে বলে—কি এত ধম্মো-ধম্মো বকছিস। ধর্ম অত ঠাট্টা তামাশার ব্যাপার নয়! ধর্ম সেই করতে পারে, যাকে ভগবান স্বীকার করেছে। কি খেয়ে আমরা ধর্ম করবো! বলি, পেট ভর্তি চিবোতে পাই না, তায় আবার ধর্ম করা।

বন্টি নিজের ওপর দায় পড়তে দেখে আঘাতের পর আঘাত করে—সংসারে এমন বহু মহাত্মা আছে, যাদের নিজের পেট না-ই ভরুক, কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশীদের নেমন্তন্ন করে বেড়ায়; নইলে সারা দিন বনে বাদাড়ে কাঠ কেটে বেড়াতো না। এমন ধর্মাত্মা লোকেদের পরিবার রাখার কিসের দরকার—এটাই আমার বুদ্ধিতে কুলোয় না। ধর্মের রথ কি একা টানা যায় না?

ভোঁদু এই আঘাতে ছটফট করে ওঠে। তার পেশি বহুল দেহ ফুলে ওঠে, মাথায় রক্ত চেপে ধরে। এক ধমকে সে এই অবলা নারীর মুখ বন্ধ করে দিতে পারে; কিন্তু ধমক দেয়া সে শেখে নি। গোটা কঞ্জড়* পরিবারে যার পরাক্রমের খ্যাতি ছিল, যে একাকী পঞ্চাশ-একশ জন যুবকের নেশা নামিয়ে দিতে পারে, সে এই অবলার সামনে টুঁ' শব্দও করতে পারে না। চাপা গলায় বলে—পরিবার ধর্ম বিক্রী করার জন্য আনা হয় না, ধর্ম পালনের জন্য আনা হয়।

এই কঞ্জড় দম্পতি আজ তিনদিন যাবৎ আরও কয়েক ঘর কঞ্জড় পরিবারের সঙ্গে এই মাঠে এসে জমায়েত হয়েছে। গোটা মাঠে শুধু গোলপাতার ছাউনি আর ছাউনি নজরে পড়ে। তিন হাত চওড়া ও চারহাত লম্বা ছাউনির ভেতর একটা গোটা পরিবার জীবনের যাবতীয় ব্যাপারের সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে বাস করে। এক

* কঞ্জড়—যাযাবর সম্প্রদায়

কোনে যাঁতা, এক কোণে রান্নার জায়গা, এক কোণে চাল-ডাল রাখার মটকা। দোরে ছোট একটা খাটিয়া বাচ্চাদের জন্য রাখা আছে। প্রতিটি পরিবারের সঙ্গে দু-একটা মোষ, বা গাধা। যখন আস্তানা তুলে ফেলা হয়, তখন সমস্ত গেরোস্থালি এই জন্তুদের পিঠে চাপিয়ে দেয়া হয়। এখানে কঞ্জড়দের এই ভাবেই জীবন। গোটা বস্তি এক সঙ্গে থাকে। নিজেদের মধ্যে বিয়ে-শাদি, দেয়া-নেয়া, ঝগড়া-ঝাটি। এই পৃথিবীর বাইরে নিখিল সংসার তাদের কাছে কেবল শিকার ভূমি। যে এলাকায় তারা হাজির হয়, পুলিশ অবিলম্বে এসে তাদের খবরদারী করতে শুরু করে। তাদের আস্তানার চারদিকে চৌকিদারের পাহারা। স্ত্রী কিংবা পুরুষ কোন গ্রামে গেলে, দু চারজন চৌকিদার তাদের সঙ্গে যায়। রাত্রেও তাদের হাজিরা নেয়া হয়। তবুও আশে-পাশের গ্রামে আতঙ্ক ছেয়ে থাকে ; কেননা কঞ্জড়রা কারো ঘরে ঢুকে যা ইচ্ছে তুলে নেয়, এবং একবার যা তাদের হাতে যায় তা কখনও ফিরে আসে না। রাত্রে প্রায় তারা চুরি করতে বেরোয়। তাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকাটাই চৌকিদাররা কুশল ও নিরাপদ মনে করে। কারণ, তাতে তারা কিছু মাল সরাতে পারে, তাছাড়া প্রাণ ও রক্ষে পায়। কর্তব্যে কড়া হওয়ায় প্রাণের আশঙ্কা থাকে, পাবার আশা বাদ দাও, কঞ্জড়-রা একটা সীমার বাইরে কারো চাপ সহ্য করতে নারাজ। বস্তিতে একমাত্র ভোঁদুই আপন পরিশ্রমের আয়ে ভরণ-পোষণ করে ; অবশ্য এটা কারণ নয় যে সে পুলিশওলাদের খোসামোদ করতে পারে না। আসলে, তার স্বতন্ত্র আত্মা আপন বাহুবলে অর্জিত কোন বস্তুতে ভাগ দেয়া স্বীকার করে না, সেইজন সে কখনও এমন সুযোগ আসতে দেয় না।

বন্টি তার স্বামীর এই আচার নিষ্ঠা দু চোখে দেখতে পারে না, তার অন্যান্য বোনেরা নতুন-নতুন শাড়ি, নতুন-নতুন গয়না পরে, বন্টি তা দেখে দেখে স্বামীর অকর্মন্যতায় কুঁকড়ে যায়। এই ব্যাপারে

দু-জনের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটিও হয়েছে; কিন্তু ভোঁদু তার পরলোক নষ্ট করতে রাজী হয়নি। আজও সকালে এই সমস্যা এসে দাঁড়াতে, ভোঁদু কাঠ কাটতে জঙ্গলের দিকে চলে যায়। নেউল পাওয়া গেলে চোখের জল মোছা যেত, কিন্তু আজ নেউলও পাওয়া যায়নি।

বন্টি বলে ওঠে—যার দ্বারা কিছু হয় না, তারাই ধর্মাত্মা হয়ে পড়ে। বলে না ষাঁড় নিজের মাড়েই খুশী।

ভোঁদু বলে—তার মানে, আমি কি অকর্মন্য?

বন্টি এই প্রশ্নের সোজা-সরল উত্তর না দিয়ে বলে—আমি কি করে বলবো, তুমি কি? আমি শুধু এটুকু জানি, এখানে পাই-পয়সার জিনিষের জন্যও চেয়ে থাকতে হয়। এখানে সকলকে শাড়ি-গয়নায় হাসি-খুশী দেখি। আমার কি শাড়ি-গয়না, হাসি-খুশী করার সাধ হয় না? তোমার হাতে পড়ে জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল।

ভোঁদু কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন থেকে বলে—বুঝলি, ধরা যদি পড়ি, তাহলে কম করেও তিন বছর জেল।

বন্টি বিচলিত হয় না। বলে—আর সকলে যখন ধরা পড়ে না, তুমিই বা ধরা পড়বে কেন?

'আর সকলে পুলিশকে দলে টেনে নেয়, দারোগাবাবুর পা টেপে, চোকিদারের খোশামদ করে। তুই কি চাস, আমি আর সকলের মত সকলকে খোসামদ করে বেড়াই।

বন্টি তার জেদ ছাড়ে না—আমি তোমার সঙ্গে সতী হতে আসিনি। তাছাড়া, তোমার ছোরা-দা'য়ে কে আর কতটুকু ভয় পায়। জন্তু জানোয়ার যখন ঘাস ভূষি পায় না, তখন বেড়া ভেঙ্গে মাঠে ঢুকে পড়ে। আমি তো সামান্য মানুষ।

ভোঁদু এর কোন জবাব দেয় না। তার স্ত্রী অন্যের ঘর করুক, এই কল্পনা তার পক্ষে অপমানের সামিল। আজ বন্টি এই প্রথম তাকে সতর্ক করে। অদ্যাবধি ভোঁদু এই ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিন্ত ছিল।

এখন এই নতুন সম্ভাবনা তার সামনে হাজির হয়। সেই দুর্দিন—যতদিন নিজের শক্তি আছে ধারে কাছে আসতে দেবে না।

ভোঁদুর দৃষ্টিতে আজ আর সেই ইজ্জৎ নেই, ভরসাও নেই। মজবুত দেয়ালকে দাঁড় করার কোন দরকার হয় না। কিন্তু দেয়াল যখন নড়তে থাকে, তখন তা সামলানো প্রয়োজন পড়ে। আজ ভোঁদুর কাছে তার দেয়াল নড়ার অনুভব হয়।

আজ পর্যন্ত বন্টি তার নিজের ছিল সে যতটা নিজের তরফ থেকে নিশ্চিন্ত ছিল, ততটা তার তরফ থেকেও। সে নিজে যেমন থাকত, তাকেও তেমন রাখত। যা নিজে খেত, তা তাকেও খেতে দিত। তার জন্য বিশেষ চিন্তা ছিল না, কিন্তু আজ জানতে পারল, সে তার নয় ; এখন তাকে বিশেষ রূপে সৎকার করতে হবে ; বিশেষ ভাবে হৃদয় জয় করতে হবে।

সূর্যাস্তের সময়। সে দেখে, তার গাধা মাথা ঝুকিয়ে চুপচাপ মাঠ থেকে ফিরে আসছে। ভোঁদু কখনও গাধার খাবার-দাবারের কথা চিন্তা করেনি, কেন না গাধা তো আর অন্য কাউকে মনিব করার জন্য সাবধান-বাণী দিতে পারে না। ভোঁদু বাইরে বেরিয়ে আজ গাধাকে আদর করে, পিঠে হাত বোলায়, তারপর তাকে জল খাওয়ানোর জন্য বালতি ও দড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়।

॥ ২ ॥

পরদিনই পাড়ার এক ধনী চৌধুরী পরিবারের বাড়ীতে চুরি হয়। সেই রাতে ভোঁদু বাসায় ছিল না। বন্টি চৌকিদারকে বলে—ভোঁদু তো জঙ্গল থেকে ফেরে নাই। ভোরবেলায় ভোঁদু ফিরে আসে। তার কোমরে টাকার একটা থলে। কিছু সোনার গয়নাও সঙ্গে। বন্টি সঙ্গে সঙ্গে গয়নাগুলো নিয়ে একটা গাছের গোড়ায় গর্ত করে রেখে দেয়। টাকার আর কি বা চিহ্ন হতে পারে।

ভোঁতু জিজ্ঞেস করে—যদি কেউ জিজ্ঞেস করে এত টাকা পেলে কোথায়, কি বলবি ?

বন্টি চোখ নাচিয়ে জবাব দেয়—বলবো, তোমায় বলবো কেন, দুনিয়াশুদ্ধ লোক আয় করছে, কাউকে হিসেব দেয় নাকি ? আমিই বা হিসেব দেবো কেন ?

ভোঁতু সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় নাড়িয়ে বলে—এটা বললে কিন্তু তুই ছাড়া পাবি না বন্টি! বলে দিস, আমি তিন-চার মাস ধরে দু-চার টাকা মাস জমা করে আসছি। আমাদের আর এমন কি বেশী খরচ।

দুজনে মিলে অনেক জবাব ভেবে ফেলে—গাছের শেকড়-মূল বিক্রী করি। এক-একটা শেকড়ের জন্য মুঠো-মুঠো টাকা পাই। নেউল, কাস্তে এসব জন্তু-জানোয়ারদের চামড়া, নখ, চর্বি—সব কিছু বিক্রী করি।

এদিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে, তারা দুজনে বাজারে যায়। বন্টি নিজের জন্য পছন্দসই নানান ধরনের শাড়ি, চুড়ি, টিকলি, টিপ, সিঁদুর, পান-তামাক, তেল এবং মেঠাই কেনে। তারপর দুজনে মদের দোকানে ঢোকে। প্রচুর মদ গেলে। দু-বোতল মদ রাতের জন্য সঙ্গে নিয়ে দুজনে ঘুরে-বেড়িয়ে, গান গেয়ে, বাজিয়ে অনেক রাত করে আস্তানায় ফেরে। বন্টির পা আজ আর মাটির ওপর পড়তে চায় না। এসেই সেজেগুজে প্রতিবেশীদের কাছে নিজেকে দেখাতে শুরু করে।

সেখান থেকে বাসায় ফিরে আসে, তারপর রান্না চাপায়। ওদিকে তখন প্রতিবেশীরা টিপ্পনী কাটতে শুরু করে—

মনে হয় বেশ বড় গোছের দাঁও মেরেছে।

খুব যে ধার্মিক সেজে থাকতো।

বকোধার্মিক এক নম্বরের।

বন্টি যেন আজ বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে।

আজ ভোঁতুয়ার কত খাতির দেখ। নইলে কখনও এক ঘটি জল এগিয়ে দিতেও দেখিনি।

রাত্রে ভোঁতুর সহসা দেবীর কথা মনে পড়ে। আজ অবধি কখনও সে দেবীর বেদীতে পাঁঠা বলি দেয় নি। পুলিশের সঙ্গে সাঁট বাঁধালে বেশী খরচ; তাছাড়া কিছুটা আত্ম-সম্মান খোয়াতেও হয়। দেবী শুধু একটি পাঁঠায় রাজী হয়ে পড়ে। অবশ্য, তার দ্বারা একটা ভুল হয়েছে, তার সম্প্রদায়ের অন্যান্যরা সাধারণতঃ কার্যসিদ্ধির পূর্বে বলিদান করে। ভোঁতু এই দায়-টা নেয়-নি। যতক্ষণ না মাল তার হাতে আসে, তার ভরসায় দেব-দেবীদের খাওয়ানো তার ব্যবসায়িক বুদ্ধিতে সায় দেয় নি। অন্যান্যদের কাছে তার কৃত-কর্ম গোপন রাখাও দরকার ছিল; এজন্য কাউকে কোন আভাস দেয় নি, এমন কি বন্টিকেও বলে না—বন্টি তখন খাবার রাঁধছিল, সে পাঁঠার খোঁজে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ে।

বন্টি জিজ্ঞেস করে—খাবর সময় তুমি চললে কোথায়?

এক্ষুনি আসছি।

যেওনা, আমায় ভয় করছে।

প্রেমের নবীন প্রকাশে ভোঁতু উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে—আমার দেরী হবে না। তুই এই দা-খানা কাছে রাখ।

সে দা-খানা বার করে বন্টির কাছে রাখে, তারপর বেরিয়ে পড়ে। পাঁঠার সমস্যাও বিচিত্র। রাত্রে পাঁঠা আনবেই বা কোত্থেকে। এই সমস্যাও সে নতুন প্রণালীতে সমাধান করে। কাছের বস্তিতে একজন পাঁঠাঅলার কাছে কতকগুলো পাঁঠা আছে। মনে মনে ভাবে, সেখান থেকেই একটা পাঁঠা তুলে আনলেই হয়। দেবীর শুধু বলিদানের সঙ্গে সম্পর্ক, পাঁঠা এল কোত্থেকে, কেমন করে এল—তা দিয়ে দরকার কি।

কিন্তু বস্তির কাছাকাছি পেঁছিতেই চারজন চৌকিদার তাকে গ্রেপ্তার করে, তারপর পিঠমোড়া বেঁধে থানায় নিয়ে যায়।

॥ ৩ ॥

বন্টি রান্না সেরে সাজ-গোজ করতে থাকে। আজ তার জীবন সফল মনে হয়। খুশীতে সে বারবার ফেটে পড়ছে। জীবনে আজ প্রথমবার তার মাথায় সুগন্ধী তেল পড়ে। এতদিন ধরে আয়না তার কাছে অন্ধের মত পড়েছিল; আজ সে নতুন আয়না এনেছে। তারই সামনে বসে সে আজ চুল বাঁধে। মুখে ক্রিম ঘষে। সাবান আনতে ভুলে গেছে। সাহেব-রা সাবান মাখে বলেই এত ফর্সা হয়। সাবান হলে, তার রঙ কিছুটা হয়তো ফর্সা হতো। কাল সে কয়েক টুকরো সাবান অতি-অবশ্য আনবে, নিয়মিত মাখবে। চুল বেঁধে মাথায় চপচপে তিসি মাখে, যাতে চুল ছড়িয়ে না পড়ে। তারপর পান সাজে, চুণ একটু বেশী পড়ে। গাল পুড়ে যায়; ভাবে, পান খাওয়ার মজাটা বুঝি এরকম। নইলে, লোকেরা অত মজা করে ঝাল লঙ্কা খায় কি করে! তারপর, গোলাপি শাড়ি পরে, ফুলের মালা গলায় দিয়ে সে বারবার আয়নায় আপন চেহারা দেখে, সঙ্গে সঙ্গে তার আবলুশি রঙে লালিমা ছড়িয়ে পড়ে। পরক্ষণেই, নিজেই লজ্জা পেয়ে দৃষ্টি আনত করে। দারিদ্র্যের আগুনে নারীত্বও ভস্ম হয়ে পড়ে, তায় আবার নারীত্বের লজ্জা! ময়লা-কোঁচকানো সাড়ি পরে লজ্জা পাওয়া—কিটছা যেন ভাজা-পোড়ায় সুগন্ধি মেখে খাওয়া।

এই ভাবে সেজেগুজে বন্টি ভোঁতুর পথ দেখতে থাকে। এখনও আসছে না দেখে, সে বিরক্ত বোধ করতে থাকে। অন্যদিন সন্ধ্যে হলেই দোরগোড়ায় পড়ে থাকে, আজ কে জানে কোথায় গিয়ে বসে আছে। বন্দুকে টোটা ভরার পর শিকারী চায়, যত তাড়াতাড়ি শিকার তার সামনে আসুক। বন্টির শুষ্ক হৃদয়ে আজ জল পড়তেই তার নারীত্ব অংকুরিত হয়ে উঠেছে। বিরক্তির সঙ্গে চিন্তা হতে শুরু করে।

বাইরে বেরিয়ে সে কয়েকবার ডাক দেয়। সত্যি, তার কণ্ঠস্বরে এত অনুরাগ কখনও ছিল না। কয়েকবার মনে হয়, ভোঁতু বুঝি আসছে, বারবার ছাউনির ভেতরে ছুটে যায়, আয়নায় চেহারা দেখে নেয় পাছে কোন রকম ভুল-ত্রুটি না থাকে। এমন কম্পন, এমন শিহরণ—সত্যি তার অনুভূতির বাইরে ছিল।

সারারাত ভোঁতুর প্রতীক্ষায় বন্টি উদ্বিগ্ন থাকে। রাত যত বাড়তে থাকে, তার শঙ্কা তীব্র হতে থাকে। বস্তুতঃ আজই তার জীবন শুরু হয়েছিল, এবং আজই তার এই হাল!

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙ্গে, তখন কিছুটা অন্ধকার। রাত জাগার ফলে তার মন এবং গোটা শরীর আলস্যে ভরা। থেকে-থেকে ভেতর থেকে একটা ঢেউয়ের চাপ ঠেলে আসে, চোখ ভরে ওঠে অশ্রুতে।

সহসা কেউ বলে ওঠে—ওরে বন্টি, ভোঁতু রাত্রে ধরা পড়েছে।

॥ ৪ ॥

বন্টি থানায় পৌঁছতে ঘামে জবজবে হয়ে পড়েছিল। তার নিঃশ্বাস ফুলে উঠছিল। ভোঁতুর প্রতি দয়া নয়, বরং রাগ ধরছিল। সারা জীবন ধরে এই রকম কাজ করে এসেছে, আর চুপচাপ বসে থেকেছে। বলে-বলে যদিও বা গা-নাড়িয়ে উঠলো, তাও গেল ফস্কে। ইচ্ছে-ই যখন ছিল না, পরিষ্কার বলে দিতে পারতো—আমার দ্বারা এ কাজ হবে না। আমি কি বলেছিলাম আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ো!

ওকে দেখেই থানার দারোগাবাবু গর্জে ওঠে—এই তো ভোঁতুয়ার মেয়ে মানুষ এসেছে, একেও ধরে রাখ।

বন্টি হেঁকড়ে বলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধরবে না কেন। আমি কাউকে

থোড়াই কেয়ার করি। কোন কাজ যদি না করে থাকি, ভয় কিসের।

অফিসার ও কর্মচারী সকলের অনুরক্ত দৃষ্টি বন্টির ওপর পড়ে। ভোঁদুর প্রতি তাদের মনও কিছুটা নরম হয়ে পড়ে। ওকে রোদ থেকে ছায়ায় নিয়ে বসায়। ওর হাত দুটো পেছন মোড়া বাধা ছিল, এবং ধূলি ধূসরিত কালো শরীরে জুতো ও চাবুকের রক্তাক্ত আঘাত স্পষ্ট নজরে পড়ছিল। সে একবার বন্টির দিকে তাকায়, যেন বলে— দেখিস, এদের কথার প্যাচে আবার পড়িস্ না যেন।

থানার দারোগাবাবু ধমক দেয়—এর ভালোমানুষপনা ছাখ, যেন দেবী হয়ে গেছেন; খবরদার এর কথায় ভুলবি না। তোদের আমি রগে-রগে চিনি। এমন চাবকাবো যে পিঠের চামড়া তুলে ফেলবো; সোজা কবুল কর! সব মাল ফেরৎ দে। দিলেই তোদের মঙ্গল।

ভোঁদু বসে-বসেই বলে—কি কবুল করবো। যারা দেশকে লুটে-পুটে খায়, তাদের কেউ কিছু বলে না; আর যে বেচারা নিজের কঠিন পরিশ্রমে উপায় করে রুটি খায়, তাদের গলা কাটার জন্য পুলিশও তৈরী থাকে। কাউকে রজনানা-ভেট দেয়ার মত আমার কাছে পয়সা নেই।

থানার দারোগাবাবু কঠোর স্বরে বলে—ঠিক আছে, যা কিছু কথা বলার, সব পুরো করে দে। দেখিস্ যেন বাদ না পড়ে। কিন্তু এই সব গাল-গল্পে রক্ষে পাবি না। যদি স্বীকার না করিস, তাহলে তিনি বছরের ধাক্কা। আমার আর কিসের ক্ষতি। ছোটে লাল, একে লঙ্কার ধুনি দে। ঘর বন্ধ করে পাঁচসের লঙ্কা ধরিয়ে দে। দেখিস এক্ষুনি সমস্ত মাল এসে হাজির হবে।

ভোঁদু উদ্ধত স্বরে বলে—দারোগাবাবু, টুক্‌রো-টুক্‌রো করে কেটে ফেলো; কিন্তু কিছুই পাবে না। তুমি আমায় সারারাত ধরে মার খাইয়েছো, আমার সবকটা হাড় ভেঙ্গে চুর হয়ে গেছে। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে টেঁসে যেতো। তুমি কি মনে করো, মানুষের কাছে টাকা-

পয়সা তার প্রাণের চেয়েও বেশী দামী। প্রাণের জন্যই তো মানুষ সব ধরণের কুকর্ম করে। ধুনি ধরিয়ে দেখে নাও।

দারোগাবাবুর এবার বিশ্বাস হয়, এই ইস্পাতকে বাঁকানো বেশ শক্ত। ভোঁতুর খর্বাকৃতি থেকে শহীদের মত আত্ম-সমর্পন ঝিলিক মারে। যদিও তাঁর হুকুম তামিল হয়। দু'জন কনস্টেবল ভোঁতুকে একটা ঘরে কয়েদ করে দেয়, দুজন শুকনো লঙ্কা আনতে দৌড়ে যায়, কিন্তু দারোগার যুদ্ধনীতি পাল্টে যায়। ক্ষোভে বল্টির হৃদয় ফেটে পড়ছিল। সে জানে, চুরি করে স্বীকার করাটা কঞ্জড় জাতের নীতির মহান লজ্জার ব্যাপার; কিন্তু এঁরা কি সত্যি সত্যি ধুনিতে আগুন ধরিয়ে দেবে! এতখানি কঠোর কি এঁদের হৃদয়? মাংস রান্নার সময় মাঝে-মাঝে লঙ্কা পুড়ে গেলে, হাঁচি ও কাশিতে দম ফেটে পড়ার জোগাড়। নাকের কাছে যদি ধুনি ধরায় তাহলে প্রাণ বেরিয়ে পড়বে। যে প্রাণ হাতে করে চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলে—দারোগাবাবু, তুমি ভাবছো গরীবের মাথার ওপর কেউ নেই, কিন্তু আমি বলে রাখছি, হাকিমকে সব ঘটনা বলে দেবো। ভালো যদি চাও, ওকে ছেড়ে দাও, নইলে এর ফল ভালো হবে না।

দারোগাবাবু হেসে বলে—তোর আর কি, ও মরে গেলে অন্য কারো সঙ্গে জুড়ে বসবি। যা কিছু মাল-কড়ি এনেছে, সে সব তোরই হবে। অতই যদি টান, স্বীকার করে ওকে ছাড়িয়ে নিচ্ছিস না কেন। আমি কথা দিচ্ছি, মামলা-মোকদ্দমা চালাবো না। সব মাল ফেরৎ দে! তুই-ই ওর কানে মন্তর দিয়েছিস। গোলাপি শাড়ি, পান, গন্ধ-তেলের জন্য তুই হ্যাংলামি করেছিস। ওর এত কষ্ট-যন্ত্রণা হচ্ছে, আর তুই কিনা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিস।

সম্ভবতঃ বল্টির অন্তরাত্মায় এতদূর ধারণা ছিল না যে এঁরা অমানুষীক অত্যাচার করতে পারে; কিন্তু যখন বাস্তবিক ধুনি ধরায়, লঙ্কার তীব্র বিষাক্ত ঝাঁজ ছড়িয়ে পড়ে, এবং ভোঁতুর কাশির আওয়াজ কানে এসে লাগে, তখন তার আত্মা কাতর হয়ে ওঠে। তার সেই

দুঃসাহস অলীক রঙের মত উঠে যায়। সে দারোগা বাবুর পা জড়িয়ে ধরে, কাতর কণ্ঠে বলে ওঠে—হুজুর, দয়া করেন। আমি সব কিছু ফেরত দেবো।

ভোঁতুর কাছ থেকে তখন ধুনি সরিয়ে নেয়া হয়।

॥ ৫ ॥

ভোঁতু সশঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করে—ধুনি সরাচ্ছ যে ?

একজন চৌকিদার বলে—তোর পরিবার স্বীকার করে নিয়েছে।

ভোঁতুর চোখ, কান, মুখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল। মাথা ঘুর'ছল তার। গলার আওয়াজ প্রায় বুজে এসেছিল ; কিন্তু এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে সতর্ক হয়ে ওঠে। দু হাতের মুঠো শক্ত করে বাঁধে। বলে—কি বললে ?

বলার আর কি আছে, চুরি ধরা পড়ে গেছে। দারোগাবাবু মাল বাজেয়াপ্ত করতে গেছেন। প্রথমেই যদি স্বীকার করে নিতিস এত নির্যাতন, কষ্ট ভোগ করতে হতো না।

ভোঁতু গর্জে ওঠে—ও মিথ্যে কথা বলছে।

ওদিকে মাল বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে, আর তুই কিনা এখনও গেয়ে চলেছিস।

নিজের মর্যাদা নিজের হাতে ভেঙ্গে পড়ার লজ্জায় ভোঁতুর মাথা ঝুঁকে পড়ে। এই ঘোর অপমানের পর এখন তার নিজের জীবন, দয়া-ঘৃণা-তিরস্কার সব এই অবস্থায় নিষিদ্ধ মনে হয়। সে আপন সমাজে পতিত হয়ে পড়েছে।

সহসা বন্টি এসে দাঁড়ায়, কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ভোঁতুর রোষমুদ্রা দেখে তার কথা বন্ধ হয়ে পড়ে। ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভোঁতুর আহত মর্যাদা আহত সর্পের মত ফুঁসে ওঠে। সে বন্টিকে অগ্নি-উত্তপ্ত লাল চোখে দেখে। ঐ চোখ জোড়ায় হিংসার আগুন।

বন্টির আপাদ-মস্তক কেঁপে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পায়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। দেবতাদের অগ্নিবাণের মত ঐ আগুনের ভাটার মত চোখ জোড়া তার হৃদয়ে ছ্যাকা দিতে থাকে।

থানা থেকে বেরিয়ে বন্টি ভাবে, এবার সে যাবে কোথায়; ভোঁহু ওর সাথে থাকলে সে প্রতিবেশীদের তিরস্কার সহ্য করত। এই অবস্থায় তার পক্ষের নিজের বাসায় যাওয়াও অসম্ভব। আগুনের ভাটার মত চোখ জোড়া বার বার হৃদয়ে বিঁধতে থাকে; কিন্তু গতকালের সৌভাগ্য-বিভূতির মোহ তাকে বাসার দিকে টানতে থাকে। মদের বোতল এখন ওর ভর্তি পড়ে আছে। ফুলুরি এখনও শিকের ওপর হাড়িতে রাখা। সেই তীব্র লালসা—যা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সংসারের ভোগ্য পদার্থের দিকে মনকে চলমান করে তোলে—তাকে টেনে বাসার দিকে নিয়ে যায়।

দুপুর হয়ে এসেছে। বস্তিতে যখন পৌঁছোয়, চারদিকে থমথমে অবস্থা। কিছুদিন আগেও যে স্থান ছিল জীবনের ক্রীড়াক্ষেত্র, এখন তা একেবারে নির্জন হয়ে আছে। সম্প্রদায়ের লোকেদের তিরস্কারের এটাই ছিল ভয়ঙ্কর রূপ। সকলেই ওকে ত্যাজ্য করেছে। কেবল, তাদের ছাউনি ঐ নির্জনতায় একা দাঁড়িয়ে কাঁদছে। বন্টি যখন ভেতরে পা রাখে, সঙ্গে সঙ্গে তার মন হু-হু করে ওঠে, নির্জন ঘর দেখে চোরের মনে যেমন জেগে ওঠে—কি কি জিনিষ সে গোছাবে। এই কুটিরে কেঁদে-কেটে সে পাঁচ বছর কাটিয়েছে; কিন্তু আজ তার প্রতি মমতা উথলে উঠেছে। বহুদিন বাদে বিদেশ প্রত্যাগত দুরন্ত ছেলেকে দেখে মার মনে যেমন হয়। বাতাসে জিনিষপত্র ছড়িয়ে পড়েছে ইতস্তত। সে তাড়াতাড়ি সেগুলি সামলে রাখে। ফুলুরির হাড়ি শিকের ওপর কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে পড়েছে। সম্ভবতঃ বেড়াল থাবা বসিয়েছে। সে দ্রুত হাড়ি নাবিয়ে দেখে, ফুলুড়ি আ-ছোঁয়া রয়েছে। ভিজে ন্যাকড়া জড়ানো ছিল পানে, তা শুকিয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি ন্যাকড়া ভিজিয়ে দেয়।

কারো পদশব্দ পেয়ে তার বুক ধড়াস করে কেঁপে ওঠে। ভোঁতু আসছে। তার ঐ একজোড়া ভাটার মত চোখ! বন্টির গায়ের রোম খাড়া হয়ে ওঠে। ভোঁতুর ক্রোধের পরিচয় সে দু-একবার উপলব্ধী করেছে; কিন্তু, এবার মন শক্ত করে। কেন মারবে? কিছু বলুক, জিজ্ঞেস করুক, সওয়াল-জবাব করুক—নাকি কথায়-কথায় শুধু শুধু দা' চালিয়ে দেবে? সে তো তার সঙ্গে কোন রকম বেইমানি করেনি। বরং বিপদ থেকে তার প্রাণ রক্ষে করেছে। পৌরুষত্ব নিশ্চয়ই প্রাণের চেয়ে বেশী নয়। ভোঁতুর হয়তো প্রিয় হতে পারে, কিন্তু তার নয়। এই সামান্য ব্যাপারে ভোঁতু কি তার প্রাণ নেবে?

ছাউনির দরজা দিয়ে উঁকি মারে সে। ভোঁতু নয়, তাদের গাধা এগিয়ে আসছে।

ঐ হতভাগা গাধাকে দেখে বন্টি আজ প্রচণ্ড খুশী, যেন তার ভাই বাপের বাড়ী থেকে বাতাসার পুটুলি নিয়ে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছে। ছুটে গিয়ে গাধার ঘাড়ে হাত বুলোয়, মুখ তুলে নিজের গালে ঘষে। সে ওকে মোটেই দেখতে পারতো না; কিন্তু আজ তার সঙ্গে কত অতরঙ্গতা। সেই আগুনের ভাটার মত চোখজোড়া নেচে বেড়ায়। বন্টি শিউরে ওঠে।

সে আবার ভাবে—কোন ভাবেই কি তার ছাড়ান নেই? না হয় কেঁদে-কেটে তার পায়ের ওপর আছড়ে পড়বে। তবুও কি ছাড়বে না? এই চোখ জোড়ার কত প্রশংসাই না ও করেছে। তা থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে দেখেও কি ওর দয়া হবে না!

বন্টি মাটির ভাড়ে মদ ঢেলে গিলে ফেলে, তারপর শিকে থেকে ফুলুরি বার করে খায়। তাকে যখন মরতেই হবে, সাধ তাহলে অপূর্ণ থাকে কেন? সেই আগুনের ভাটার মত চোখ জোড়া তার সামনে চমক দিতে থাকে। সে আবার ভাড় ভরে, গিলে নেয়। বিষাক্ত চোলাই, দুপুরের এই গরম আরও ঘাতক করে তুলেছিল,

দেখতে দেখতে তার মগজ টগবগ করে ওঠে। বোতল অর্ধেক হয়ে পড়ে।

সে ভাবে—ভোঁত্বু যদি জিজ্ঞেস করে, তুই এত মদ গিলেছিস কেন? তাহলে সে কি জবাব দেবে? বলবে হ্যাঁ, গিলেছি; কেন গিলবো না, তোর জন্য তো এতসব ঘটেছে। সে এক ফোঁটাও রাখবে না। যা হবার হবে। ভোঁত্বু তাকে মারতে পারে না। অতটা নির্মম ও নয়, অতটা কাপুরুষও নয়। সে আবার ভাত ভরে, খায়। পাঁচ বছরের বিবাহীত জীবনের অতীত স্মৃতি তার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়! বহুবার তাদের দুজনের মধ্যে গৃহ যুদ্ধ বেঁধেছে। আজ বন্টির কাছে প্রতিবার নিজেরই বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে। বেচারা যা আয় করে, তার হাতেই তুলে দেয়। নিজের জন্যে কখনও এক পয়সার তামাক কিনতে হলে তার কাছ থেকেই চেয়ে নিয়েছে। সকাল সন্ধ্যে জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। সত্যি, যে কাজ ওর দ্বারা হয় না, সে করবে কি করে?

সহসা একজন কনস্টেবল এসে বলে—বন্টি, তুই কোথায়? গিয়ে দেখ, ভোঁত্বুয়ার কি হালত হয়েছে। এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। তারপর, কি মনে হয়েছে, উঠে পাথরের ওপর মাথা ঠুকতে শুরু করেছে। রক্তে ভাসাভাসি। আমরা যদি দৌড়ে গিয়ে না ধরতাম, তাহলে প্রাণ শেষ করে দিত।

॥ ৬ ॥

এক মাস কেটে গেছে। সন্ধ্যাকাল। কালো কালো মেঘ জমেছে, মুষলধারে বৃষ্টি পড়েছে। ভোঁত্বুর ছাউনি এখনও ঐ নির্জন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, ভোঁত্বু একটা খাটুলির ওপর শুয়ে আছে। ওর চেহারা ফ্যাকাশে হলুদ হয়ে উঠেছে, শরীর শুকিয়ে গেছে অনেকখানি। সে

শঙ্কিত দৃষ্টিতে বৃষ্টির দিকে চেয়ে আছে, ইচ্ছে হয় উঠে বাইরে দেখে আসে ; কিন্তু ওঠার ক্ষমতা নেই।

মাথায় ঘাসের বোঝা নিয়ে বৃষ্টিতে জবজবে বন্টিকে আসতে দেখা যায়। সেই গোলাপি শাড়ি—কিন্তু ফালা অবস্থা ; অথচ তার চেহারা খুশীতে উজ্জ্বল। বিষাদ ও গ্লানির পরিবর্তে চোখে অনুরাগ ছুঁয়ে পড়ছে। গতিতে চাপল্য, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সজীবতা—যা মনে শান্তির চিহ্ন আঁকে। ভোঁদু ক্ষীণস্বরে বলে—তুই এত ভিজছিস, দেখিস জ্বরে পড়লে এক ফোঁটা জলে দেয়ার মত কেউ থাকবে না। বলছি, এত সব করার তোর দরকার কি। দুটো গাঁট বিক্রী করে এসেছিস। আর গাঁট আনার দরকার কি ছিল ? হাড়ি করে আবার কি এনেছিস ?

হাড়িটাকে লুকিয়ে রেখে বন্টি বলে—কৈ কিছু না তো, কোথায় হাড়ি ?

ভোঁদু চেষ্টা করে খাটুলিতে উঠে বসে, বন্টির আঁচলের আড়ালে লুকনো হাড়িটাকে বার করে ওর ভেতরে নজর দিয়ে বলে—এক্ষুনি ফেরৎ দিয়ে আয়, নইলে আমি হাড়ি ভেঙ্গে ফেলবো।

বন্টি তার শাড়ি নিংড়ে জল ফেলতে-ফেলতে বলে—আয়নায় একবার নিজের চেহারাটা দেখো। ঘি-দুধ পেটে না পড়লে, সারবে কি করে ?—নাকি চিরদিনের জন্য খাটে শোয়ার ইচ্ছে ?

ভোঁদু খাটুলির ওপর শুতে শুতে বলে—নিজের জন্য একটা শাড়িও আনিসনি, বলে বলে হার মেনেছি ; অথচ আমার জন্য ঘি-দুধ সব আনা চাই। আমি ঘি খাবো না।

বন্টি স্মিত হেসে বলে—এই জন্যই তো ঘি খাওয়াচ্ছি, যাতে তুমি তাড়াতাড়ি সেরে উঠে কাজকর্ম করতে শুরু করো, আমার জন্য শাড়ি নিয়ে আসবে।

ভোঁদু হেসে বলে—আজ তাহলে সিঁদ কাটি।

বন্টি তার গালে আলতো টোকা মেরে বলে—তার আগে আমার গলা কেটো, তারপর যেও ?

# মৃতক ভোজ

শেঠ রামনাথ রোগশয্যায় শুয়ে, নিরাশার দৃষ্টিতে স্ত্রী সুশীলার দিকে তাকিয়ে বলেন—আমি সত্যি বড় হতভাগা, শীলা। আমার সঙ্গে তোমাকে সবসময় দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে। ঘরে যখন কিছু ছিল না, রাতদিন সংসারের কাজকর্মে, ছেলেদের জন্য মরেছো। যখন কিছুটা সামলেছি, তোমার আরাম করার দিন এল, আর আমি কিনা তোমাকে একা ফেলে চলে যাচ্ছি। আজ পর্যন্ত আশা ছিল, কিন্তু আজ সেই আশা ভেঙ্গে গেছে। শোন শীলা, কেঁদো না। সংসারে সকলেই মরে, কেউ দু-বছর আগে, কেউ বা দু-বছর পরে। এখন সংসারের ভার তোমার ওপর। আমি টাকা রেখে যাইনি; কিন্তু যা আছে, তা দিয়ে তোমার জীবন কোন রকমে কেটে যাবে··· ···রাজা কাঁদছে কেন?

সুশীলা অশ্রু মুছে বলে—জেদী হয়ে উঠেছে। আজ সকাল থেকে আওড়াচ্ছে মোটর গাড়ী চাই। পাঁচ টাকার কমে কি মোটর গাড়ী পাওয়া যাবে?

কদিন ধরে ছেলে দুটির ওপর শেঠজীর মায়া-মমতা জেগেছে। বলেন—আহা, আনিয়ে দাও না একটা। বেচারা কতক্ষণ ধরে কাঁদছে। কত কি আশা ছিল মনে। সব ধুলোয় মিশে গেল। রানীর জন্য একটা বিলিতি পুতুল আনিয়ে দিও। অন্যের খেলনা দেখে বেচারীর মন খারাপ থাকে। যে ধন-সম্পত্তিকে প্রাণের চেয়েও প্রিয় ভেবেছিলাম, শেষে তা ডাক্তাররা খেল। ছেলেরা কি আর মনে রাখবে বাপকে। হতভাগা বাপ ধনসম্পত্তিকে ছেলেমেয়ের চেয়ে প্রিয় ভেবেছে। কখনও এক পয়সার জিনিষও এনে দেয় নি।

শেষ সময়ে যখন সংসারের অসাড়তা কঠোর সত্য হয়ে চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন যা করেনি তার জন্য খেদ এবং যা করেছে তার জন্য পশ্চাতাপ, মনকে উদার এবং কপটতাহীন করে তোলে।

সুশীলা রাজাকে ডাকে, তারপর বুকের মাঝে জড়িয়ে কাঁদতে থাকে। সেই মাতৃস্নেহ, যা স্বামীর কার্পণ্যে ভেতরে ভেতরে গুমরে মরত, এই সময় তা যেন টগবগ করে ওঠে। কিন্তু মোটর গাড়ী আনার টাকা কোথায়!

শেঠজী জিজ্ঞেস করেন—মোটর নিবি নাকি খোকা, মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে দাদার সঙ্গে যা। ভালো দেখে মোটর আনিস।

রাজা মায়ের কান্না এবং বাবার আদর দেখে, তার ছেলেমানুষি জেদ যেন গলে পড়ে! বলে ওঠে—এখন চাই না।

শেঠজী জিজ্ঞেস করেন—কেন?

'তুমি আগে সেরে ওঠো তারপর নেবো।'

শেঠজী ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন।

॥ ২ ॥

তৃতীয় দিনে শেঠ রামনাথের মৃত্যু হল।

ধনী মানুষ বেঁচে থাকায় অনেকের দুঃখ হয়, সুখ হয় খুব কম লোকের। তার মৃত্যুতে দুঃখ কম লোকের হয়, কিন্তু সুখ হয় অনেকের। মহাব্রাহ্মণদের দল আলাদা ভাবে সুখী, পণ্ডিতেরাও সুখী এবং তার সম্প্রদায়ের লোকেরাও আনন্দিত; এই ভেবে যে তাদের সমপর্যায়ের একজন লোক হ্রাস পেল। বুক থেকে একটা কাঁটা খসল। অংশীদারদের কথা বলার দরকার নেই, এখন তারা পুরনো ঈর্ষার শোধ তুলবে। হৃদয় শীতল করার এমন সুযোগ বহুদিন পর পেয়েছে।

আজ পঞ্চম দিবস। সেই বিশাল ভবন শূন্য। ছেলেরা কাঁদছে না, হাসছেও না। মন-খারাপ করে মার কাছে বসে আছে, এবং বিধবা স্ত্রী ভবিষ্যতের অপার চিন্তার ভারে ও চাপে নির্জীব পড়ে আছে। বাড়ীতে যে কটা টাকা ছিল, সব দাহ-ক্রিয়ায় শেষ হয়েছে, এখনও বাহু সংস্কার বাকী আছে। ঈশ্বর কি করে যে গতি করবেন।

কেউ দরজায় ডাকে। ঝি এসে শেঠ ধনীরামের আগমন সংবাদ দেয়। ছেলে দুটি বাইরে ছুটে যায়: সুশীলার মন মুহূর্তে সবুজ হয়ে ওঠে। শেঠ ধনীরাম তাদের সমাজের সমাজপতি। অবলার ক্ষুদ্র হৃদয় শেঠজীর এই বদান্যতায় পুলকিত হয়ে ওঠে। সমাজের মাথা-অলা লোক যে। এঁরা যদি অনাথদের খোঁজ-খবর না নেয়, তাহলে নেবে কে। ধন্য এসব পুন্যবাণ লোক, বিপদে-আপদে যারা দীন-দরিদ্রের রক্ষা করেন।

ভাবতে ভাবতে সুশীলা ঘোমটা টেনে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। দেখে, ধনীরাম ছাড়া আরও অতিরিক্ত কয়েকজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে।

ধনীরাম বলে—বৌমা, রামনাথ ভাইয়ের অকাল-মৃত্যুতে আমাদের যা দুঃখ তা শুধু আমাদের মন-ই জানে। কিই বা এমন বয়স হয়েছিল তার ; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা। এখন আমাদের একমাত্র ধর্ম ঈশ্বরের ওপর ভরসা রাখা ; আর ভবিষ্যতের জন্য কোন উপায় বার করা। এমন কাজ করা উচিৎ যাতে বাড়ীর আব্রু ঠিক থাকে এবং ভাইয়ের আত্মা সন্তুষ্ট হয়।

কুবেরদাস সুশীলাকে তীর্যক চোখে দেখে বলে—মর্যাদা খুব বড় জিনিস। সেটা রক্ষা করা আমার ধর্ম। কিন্তু কমলির বাইরে পা রাখাও উচিৎ নয়। তোমার কাছে এক টাকা আছে, বৌমা? কি বললে, কিন্তু নেই?

সুশীলা—বাড়ীতে আর টাকা কই, শেঠজী। যা ছিল, সব ওনার রোগে শেষ হয়ে গেছে।

ধনীরাম—এ যে নতুন সমস্যা দাঁড়াল দেখছি। এমন অবস্থায় আমাদের কি করা উচিৎ, কুবেরদাস ?

কুবেরদাস—যে করেই হোক, ভোজ দিতেই হবে। তবে, হ্যাঁ, নিজের সামর্থ্য দেখে আয়োজন করা উচিৎ। আমি ধার-কর্জ করতে বলি না। বাড়ীতে যত টাকার ব্যবস্থা করা সম্ভব, তাতে চেষ্টার ত্রুটি থাকা উচিৎ নয়। মৃতের প্রতি আমাদেরও কিছু কিছু কর্তব্য পালনীয়। সে আর কখনও ফিরে আসবে না, চিরকালের জন্য তাঁর সম্পর্ক ছিঁড়ে যাচ্ছে। এই জন্য সবকিছু সামর্থ্য অনুযায়ী হওয়া উচিৎ। ব্রাহ্মণদেরও সেই একই মতামত অর্থাৎ মর্যাদার রক্ষা হোক।

ধনীরাম—তোমার কাছে কি কিছু নেই, বৌমা। দু-চার হাজারও নয়।

সুশীলা—আমি আপনাকে সত্যি কথা বলছি, আমার কাছে কিছু নেই। এমন সময়ে কি মিথ্যে বলবো ?

ধনীরাম কুবেরদাসের দিকে অর্ধ-অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে তাকিয়ে বলে— তবে তো এই বাড়ী বিক্রী করতে হবে।

কুবের দাস—এ ছাড়া আর করবেই বা কি। নাক কাটানো ভালো নয়। রামনাথের কত নাম-ডাক ছিল, সমাজের একজন স্তম্ভ গোছের লোক। এ সময় এই একমাত্র উপায়। কুড়ি হাজার টাকা আমার পাওনা আছে। সুদ-বাট্টা জুড়ে পঁচিশ হাজার প্রায় আমার। বাকীটা ভোজে খরচ-পাতি হবে। আর যা অবশিষ্ট থাকবে, ছেলেপেলেদের কাজে লাগবে।

ধনীরাম—আপনার কাছে কত টাকায় বন্ধক রেখেছিল ?

কুবের—কুড়ি হাজার। শ-য়ে একটাকা সুদ।

ধনী—আমি যেন কিছু কম শুনেছিলাম।

কুবের—বন্ধক-নামা রাখা আছে। মৌখিক কথাবার্তা তো নয়। দু-চার হাজারের জন্য আমি মিথ্যে কথা বলবো না।

ধনী—না, না, আমি তা বলছি না। তা, তুমি তো সব শুনলে বৌমা। পঙ্কজনের রায় বাড়ীটা বিক্রী করে দেয়া হোক।

সুশীলার ছোট ভাই সন্তলাল এ সময় এসে হাজির। শেষ কথাটা তার কানে যায়। সে বলে ওঠে—কেন বিক্রী করবে? জ্ঞাতি-কুটুম্ব ও সমাজের লোকের ভোজের জন্য? সমাজের লোকেরা খেয়ে দেয়েই কেটে পড়বে, তখন এই অনাথদের রক্ষা হবে কি করে? এদের ভবিষ্যতের জন্যও কিছু ভাবা উচিৎ।

ধনীরাম ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখে বলে—এসব ব্যাপারে আপনার নাক গলানোর কোন অধিকার সেই। শুধু ভবিষ্যতের চিন্তা করলেই কাজ হয় না! মৃত আত্মার সদ্‌গতি করাও দরকার। আপনার আর কি? উপহাস আমাদের হবে। সংসারে মর্যাদার চেয়ে বড় কিছু নেই। মর্যাদার জন্য মানুষ নিজের প্রাণ পর্যন্ত দেয়। মর্যাদাই যখন রইলো না, তখন আর কি রইলো? যদি আমাদের পরামর্শ নিতে চাও, তাহলে আমরা এটাই বলবো। এরপর বৌমার ইচ্ছে, সে যেমন মনে করে করুক, কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না। চলুন কুবের দাস, যাওয়া যাক।

সুশীলা ভয়ে ভীত হয়ে বলে—দাদার কথায় কিছু মনে করবেন না, এর ধরণই এ রকম। আমি আপনার কথা অগ্রাহ্যি করিনি, আপনি আমার বয়োজেষ্ঠ। বাড়ীর অবস্থা আপনার সবই জানা। স্বামীর আত্মাকে আমি দুঃখী করতে চাই না; কিন্তু তাঁর ছেলেমেরা যখন দোরে-দোরে ঘুরে মরবে; তাঁর আত্মা কি দুঃখিত হবে না? মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। ছেলেদের লেখা-পড়া শেখাতে হবে। ব্রাহ্মণদের ভোজ দিন; কিন্তু লৌকিকতা করার আমার সামর্থ্য নেই।

মহানুভব দুজনের গালে যেন চড় এসে লাগে—এত বড় অধর্ম। এমন কথা কি জিভ দিয়ে উচ্চারণ করা যায়। সমাজপতিরা নিজেদের মুখে চুণকালি পড়তে দেবে না। লোকেরা এই বিধবার দিকে চেয়ে হাসবে না, হাস্যস্পদ হবে পঞ্চেরা। এমন হাস্যকর ব্যাপার তারা

কি করে সহ্য করবে ? এমন বাড়ীর দরজায় উঁকি মারাও পাপ।

সুশীলা কেঁদে বলে—আমি অনাথ, ছেলেমানুষ, আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন না। আপনারা যদি আমায় ত্যাগ করেন, আমার নির্বাহ হবে কি করে ?

এরি মধ্যে আরও দুজন লোক এসে হাজির। একজন বেশ মোটা, অপরজন খুবই রোগা। গুণানুসারে তাদের নাম যথাক্রমে ভীমচন্দ্র এবং দুর্বলদাস। ধনীরাম সংক্ষেপে তাদের পরিস্থিতি বুঝিয়ে দেয়। দুর্বলদাস সহৃদয়ে বলে—এমন করা কি যায় না যে আমরা সকলে মিলে কিছু টাকা তুলে দিই। তাঁর ছেলে যখন বড় হবে, সেই টাকা ফেরৎ পাবো। যদি না-ও পাওয়া যায়, একজন বন্ধুর জন্য সামান্য ক্ষতি সয়ে নেওয়া এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়।

সন্তলাল খুশী হয়ে বলে—যদি এতখানি দয়া করেন, তাহলে কিসের চিন্তা ?

কুবেরদাস চোখ রাঙিয়ে বলে—তুমি যে আগা-মাথা ছাড়া কথা বলছো দুর্বলদাস। এ সময়ে বাজারে কার কাছেই বা ফালতু টাকা আছে।

ভীমচন্দ—তা অবশ্য ঠিক, বাজারে এমন মন্দাভাব কখনও দেখা দেয় নি ; কিন্তু নির্বাহ করতে হবে।

কুবেরদাস গোয়াতু´মি করে। সে সুশীলার বাড়ীর ওপর দাঁত বসিয়ে থাকে। এমন কথাবার্তায় তার স্বার্থে বাধা পড়তে থাকে। সে তার টাকা এবার আদায় করে ছাড়বে। মেয়েমানুষদের ঝামেলায় পড়বে না।

ভীমচন্দ তাকে কোন রকমে সচেতন করে ; কিন্তু ভোজ যে দিতেই হবে। ঐ কর্তব্য পালন না করা সমাজের নাক কাটার সামিল।

সুশীলা দুর্বলদাসের মাঝে সহৃদয়তার আভাষ পায়। তাঁর দিকে দীন নেত্রে চেয়ে বলে—আমি কি সমাজের বাইরের লোক। আপনারা মনিব যা উচিৎ মনে করেন, করুন।

ছুর্বলদাস—তোমার কাছে কিছু গয়নাগাটি আছে নিশ্চয়ই, বৌমা?

হ্যাঁ, গয়না কিছু আছে। অর্দ্ধেক তাঁর রোগে বিক্রী হয়ে গেছে, বাকি অর্দ্ধেকটা আছে। সুশীলা সমস্ত গয়না 'পঞ্চ'দের সামনে এনে রাখে ; ওদের রায়ে এসব গয়না বড় জোর তিন হাজারে দাড়াবে।

ছুর্বলদাস পুটলি হাতে রেখে ওজন করে বলে ওঠে—তিন হাজার কেন? আমি সাড়ে তিন হাজার পাইয়ে দেবো।

ভীমচন্দ আবার পুটলি ওজন করে, বলে—আমার ডাক চার হাজারের।

কুবেরদাস আবার বাড়ী বিক্রীর প্রশ্ন করার সুযোগ পায়—চার হাজারেই বা কি এসে যায়। এ হলো সমাজের ভোজ, এ তো আর দোষ কাটানো নয়। সমাজের লৌকিকতায় কম করেও দশ হাজারের খরচ। বাড়ী তাকে বিক্রী করতেই হবে।

সন্তলাল ঠোঁট চিবিয়ে বলে—আমি জানতে চাই, আপনারা এতখানি নির্মম! এই অনাথ ছেলেদের ওপর আপনাদের কি দয়া হয় না? ওদের রাস্তার ভিখিরি করেই ছাড়বেন ?

কিন্তু সন্তলালের ফরিয়াদের প্রতি কেউ মন দেয় না। বাড়ী বিক্রীর কথাবার্তা থেকে তাদের সরাতে পারে না। বাজারের অবস্থা মন্দা। ত্রিশ হাজারের বেশী দাম পাবে না, ওদিকে কুবেরদাসেরই প্রাপ্য পঁচিশ হাজার। হাতে থাকবে পাঁচ হাজার। গয়না থেকে পাওয়া যাবে চার হাজার। এই ভাবে ন'হাজারে টেনেটুনে ব্রাহ্মণ ভোজ ও সমাজের ভোজ ছুটোই করে দেয়া যাবে।

সুশীলা ছেলে ছুটোকে সামনে এনে করজোড়ে বলে— পঞ্চ'জন আমার ছেলেদের মুখের দিকে তাকান। আমার ঘরে যা কিছু আছে, সব আপনারা নিয়ে যান ; কিন্তু বাড়ীটা বাদ দিন —নইলে কোথাও আমার ঠাঁই হবে না। আপনাদের পা ধরছি, এ সময় বাড়ীটা বিক্রী করবেন না।

এই মূর্খামির কি জবাব দেবে তারা! 'পঞ্চ'রা নিজেরাই চাইছে

বাড়ী যেন বিক্রী করতে না হয়। অনাথ ছেলেদের সঙ্গে তাদের কোন শত্রুতা নেই ; কিন্তু সমাজের ভোজ কি ভাবে দেয়া যায়! কম করেও পাঁচ হাজার জোগাড় করতে পারে, তাহলে বাড়ীটা রক্ষে পেতে পারে ; কিন্তু যদি এমন না করতে পারে, তাহলে বাড়ী বিক্রী করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

কুবের দাস অবশেষে বলে—দেখ বৌমা, বাজারের অবস্থা এখন বড় মন্দা। কারো কাছ থেকে টাকা ধার পাবে না। ছেলেপেলেদের ভাগ্যে লেখা থাকলে, ভগবান অন্য উপায়ে দেবে। উপায়ে রুজি, অজুহাতে মৃত্যু। ছেলেপেলের চিন্তা করো না। ভগবান যাকে জন্ম দেয়, তার জীবিকার জোগান প্রথম থেকেই করে রাখে। আমি তোমায় বুঝিয়ে-শুঝিয়ে হার মেনেছি। যদি তুমি এখনও তোমার জেদ না ছাড়ো, তাহলে আমরা কোন খোঁজ-খবর নেবো না। তখন, তোমার এখানে বাস করাই দায় হয়ে উঠবে। শহরের লোকেরা তোমার পেছনে লাগবে।

বিধবা সুশীলা কি আর করে। পঞ্চদের সঙ্গে ঝগড়া করে থাকবে কি করে। জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে কে আর শত্রুতা করে? ঘরের ভেতরে যাবার জন্য উঠে দাড়ায়, কিন্তু সেখানেই মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে যায়। এতক্ষণ তবুও আশায় সামাল দিয়ে ছিল। ছেলেপেলেদের লালন-পালনে সে তার বৈধব্য ভুলতে পারত ; কিন্তু এখন অন্ধকার, চারিদিকে।

॥ ৩ ॥

শেঠ রামনাথের বন্ধুদের তার বাড়ীর ওপর পূর্ণ অধিকার ছিল। বন্ধুদের যদি অধিকার না থাকে, তাহলে আর কার থাকবে। তাঁর স্ত্রী যখন এই সাদামাটা কথাটা বুঝতে পারে না, যে সামাজিকতা-

লৌকিকতা করা এবং ধূমধাম সহযোগে উদার মনে তা করা—একটা বাধ্যতামূলক ব্যাপার, তখন তাকে কিছু বলাই অর্থহীন। গয়না কে আর কিনবে? ভীমচন্দ চার হাজার দাম ধরেছিল; কিন্তু এখন সে বুঝতে পেরেছে তার ভুল হয়েছে। দুর্বলদাস তিন হাজার দাম ধরেছিল; তাই গয়না তার হাতে যায়। এই ব্যাপার নিয়ে দুর্বলদাস এবং ভীমচন্দের মধ্যে কিছুটা তর্কাতর্কিও ঘটে; কিন্তু ভীমচন্দকে ঢোঁক গিলে থাকতে হয়। ন্যায় যে দুর্বলের পক্ষে।

ধনীরাম কটাক্ষ করে—দেখ দুর্বলদাস, মাল নিয়ে যাচ্ছ বটে; কিন্তু তিন হাজারের চেয়ে বেশী। আমি ন্যায়-নীতির ধ্বংস হতে দেবো না।

কুবের দাস—আরে, ঘরের জিনিষ ঘরেই রইলো, বাইরে তো আর যায় নি। একদিন না হয় বন্ধুদেব নেমন্তন্নই রইলো।

এ কথা শুনে চার মহানুভব হাসে। এই কাজ শেষ হতে বাড়ী বিক্রীর প্রশ্ন ওঠে। কুবের দাস ত্রিশ হাজার দিতে রাজী; কিন্তু আইনানুসারে কাজ না করা পর্যন্ত সন্দেহ মিটবে না। সন্দেহ আর রাখা কেন! একজন দালালকে ডেকে আনানো হয়। বেঁটে ধরণের ফোঁকলা মুখ, বয়স সত্তর। নাম চোখেলাল।

কুবের দাস বলে—চোখেলালবাবুর সঙ্গে আমার তিন বছর ধরে আলাপ। মানুষ তো নন, যেন রত্ন।

ভীমচন্দ—শোনো চোখেলাল, এই বাড়ীটা বিক্রী করতে হবে। একটা ভাল খদ্দের জোটাও। তোমার দালালি, দেয়া হবে।

কুবের দাস—বাজারের অবস্থা ভালো নয়, তবুও আমাদের এও দেখতে হবে রামনাথের ছেলেপেলেদের যাতে লোকশান না হয়। [ চোখেলালের কানে ] ত্রিশের বেশী উঠবে না।

ভীমচন্দ—দেখো কুবের দাস, এ কিন্তু ভাল ব্যাপার নয়।

কুবের দাস—আমি আবার কি করলাম। আমি শুধু এটুকু বলেছি ভাল দাম তুলতে।

চোখেলাল—আমাকে এতসব কথা বলার দরকার নেই। আমি আপন ধর্ম ভাল করে জানি। রামনাথ বাবু আমারও বন্ধু ছিলেন। আমি এও ভালো করে জানি, এই বাড়ী তৈরী করতে এক লাখের চেয়ে এক পয়সাও কম লাগেনি; কিন্তু বাজারের অবস্থা তো আপনাদের কাছে লুকনো নেই। এখন পঁচিশ হাজারের চেয়ে বেশী উঠবে না। সুবিধে মত কোন খদ্দের পেলে দশ-পাঁচ হাজার হয়তো উঠতে পারে; এখন ২৫ হাজার পাওয়াও বেশ শক্ত। ফেল কড়ি মাখো তেলের অবস্থা এখন।

ধনীরাম—পঁচিশ হাজার বড্ড কম ভাই, আর কিছু না হোক অন্ততঃ ত্রিশ হাজার করিয়ে দাও।

চোখেলাল—ত্রিশ কেন, আমি চল্লিশ তুলে দিতে পারি, কিন্তু খদ্দের পেলে তো। আপনারা বলছেন যখন আমি ত্রিশ হাজারের কথা বলবো।

ধনীরাম—ত্রিশ হাজারেই যখন দিতে হচ্ছে, তাহলে কুবের দাস কেন নিচ্ছে না। এত সস্তায় অন্যকে দেওয়া কেন?

কুবেরদাস—আপনাদের সকলের যখন এইমত, তাহলে এমনই হোক।

ধনীরাম 'হাঁ-হাঁ' বলে স্বীকৃতি জানায়। ভীমচন্দ মনে-মনে চটে গেলেও চুপ করে থাকে। এই সওদা পাকা হয়। আজই উকিলকে দিয়ে বিক্রর কোবলা লিখিয়ে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে রেজেস্ট্রীও হয়। সুশীলার সামনে বিক্রয়-কোবলা নয়, সে ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস নেয়, সজল-চোখে তার ওপর হস্তাক্ষরে সই করে। এ ছাড়া তার আর এখন কোথাও গত্যন্তর নেই। অকৃতজ্ঞ বন্ধুর মত এই বাড়ীও সুখের দিনে সঙ্গ দিয়ে দুঃখের দিনে তার সঙ্গ ছেড়ে দিচ্ছে।

'পঞ্চ' রা সুশীলার গৃহাঙ্গণে বসে সমাজের লোকেদের জন্য দস্তাবেজ করছিল, অনাথ বিধবা তখন ওপর তলায় বসে

ভাগ্যের কথা ভেবে কাঁদছিল। এদিকে দস্তাবেজ প্রস্তুত, ওদিকে বিধবার চোখ বেয়ে অশ্রুবিন্দু তার ওপর এসে পড়ে।

ধনীরাম ওপরে তাকিয়ে বলে—জলের ছিঁটে কোত্থেকে এল ?

সন্তরাম—দিদি বসে কাঁদছে। দস্তাবেজে সে রক্ত অশ্রুর মোহর এঁকে দিয়েছে।

ধনীরাম ( উচ্চস্বরে ) একি, তুমি কাঁদছো কেন, বৌমা ? এখন কান্নাকাটির সময় নয়, তোমার খুশী হওয়া উচিৎ যে 'পঞ্চ' লোকেরা তোমার বাড়ীতে আজ এই শুভ কাজে জমায়েত হয়েছে। যে স্বামীর সঙ্গে তুমি এতদিন ভোগ-বিলাস করেছো, তারই আত্মার শান্তি কামনায় তুমি কি দুখী মনে করছো ?

সমাজের লোকেদের মাঝে দস্তাবেজ। এদিকে তিন-চারদিন 'পঞ্চ' জনেরা ভোজের প্রস্তুতিতে কাটায়। ধনীরামের আড়ত থেকে ঘি আসে। ময়দা-চিনিও তারই আড়তের। পঞ্চম দিনে সকালে ব্রাহ্মণ ভোজন অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যে-বেলায় সুশীলার বাড়ীর দোরগোড়ায় সমাজের লোকেদের ঘোড়াগাড়ী এবং মোটরের সার বেঁধে যায়। ভেতরে অতিথিদের পংক্তি। গৃহাঙ্গণে, বৈঠকখানায়, দালানে, বারান্দায়, ওপরের ছাদে, নীচে-ওপরে সর্বত্র অতিথিতে গিজগিজ। সকলেই ভুরিভোজ করছে, সেই সঙ্গে 'পঞ্চ'দের প্রশংসায় মুখরিত।

'খরচ সকলেই করে ; কিন্তু আয়োজনের রীতি-নীতি জানা দরকার। এমন সুস্বাদু খাবার খুব কমই দেখা গেছে।'

'শেঠ চম্পারামের ভোজের পর এমন ভোজ রামনাথের সময় হলো।'

'অমৃতিগুলো বেশ মুচমুচে হয়েছে।'

'রসগোল্লায় মেওয়ার পুর আছে।'

'এতসবের প্রশংসা 'পঞ্চ'জনের প্রাপ্য।'

ধনীরাম নম্রভাবে বলে—সবই আপনাদের দয়া—এত প্রশংসা করছেন—। রামনাথের সঙ্গে আমার ভাই সম্পর্ক। আমরা না

করলে কে করবে? চারদিন ধরে চোখের পাতা এক করতে পারিনি।

আপনি ধন্য! বন্ধু এমনই হওয়া উচিৎ।

তা অবশ্য ঠিক। আপনি রামনাথের নাম রেখেছেন। সমাজের লোকেরা ভোজের আয়োজনই দেখে। টাকাপয়সা দেখতে আসে না।

অতিথিরা বারবার প্রশংসা করে খাবার খেয়ে চলে, ওদিকে ঘরে বসে সুশীলা ভাবে—হায়, সংসারে এমন স্বার্থপর লোকেরাও আছে। সংসার কি এতদূর স্বার্থপর হয়ে পড়েছে? সকলেই ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে ভোজন করে চলেছে। কেউ একবার এসে খোঁজ-খবর নেয় নি, অনাথ ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু রাখা আছে কিনা।

॥ ৪ ॥

এক মাস পেরিয়ে যায়। সুশীলা এখন এক-একটি পয়সার জন্য বিব্রত। নগদ কিছুই ছিল না, ওদিকে গয়নাগাঁটিও বেরিয়ে গেছে। এখন কিছু বাসন-কোসন রয়ে গেছে। অনেক ছোটখাট বিল শোধ করার আছে। ডাক্তারের কিছু টাকা, দরজির কিছু, কিছু বেনের। মাস শেষ হতে হতে তার হাতে আর কিছু অবশেষ থাকবে না। বেচারা সন্তলাল একটা দোকানে হিসেব-সরকারের কাজ করে। মাঝে-মাঝে কে এসে এক-আধ টাকা দিয়ে যায়। এদিকে খরচের হাত ছড়িয়ে পড়েছিল, ছেলেমেয়েরা অবস্থা বুঝতে পারত। মাকে আর বিরক্ত করত না; কিন্তু বাড়ীর সামনে দিয়ে কোন ফলঅলা গেলে, অন্য ছেলেদের ফল বা মেঠাই খেতে দেখলে, তখন তাদের মুখে জল না আসুক চোখে জল নিশ্চিত ভরে আসত। সেই ছেলেরা—কিছুদিন আগেও, মেওয়া মেঠাই'র দিকে চেয়ে দেখত না, এখন তারা এক-একটি পয়সার জন্য তৃষিত। সেই সব লোক—যারা সমাজের

লোকেদের ভোজ দিয়েছিল, এখন তারা ঘরের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায় ; কিন্তু ভুলেও একবার উঁকি দিয়ে দেখে না।

সন্ধ্যে হয়েছে। সুশীলা উনুন ধরিয়ে বাঁধছে, এবং ছেলেমেয়ে দুটি উনুনের ধারে বসে ক্ষুধিত চোখে দেখছে। উনুনের অন্য ধারে ডাল হওয়ার প্রতীক্ষায় তারা বসে আছে। মেয়েটি এগারো বছরের, ছেলেটি আট বছরের।

মোহন অধীর হয়ে বলে—মা আমায় শুকনো রুটিই দাও। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

সুশীলা—এখনও ডাল কাঁচা রয়েছে যে খোকা।

রেবতী—আমার কাছে একটা পয়সা আছে না। দই নিয়ে আসি।

সুশীলা—পয়সা কোত্থেকে পেলি ?

রেবতী—কাল পুতুলের বাক্স থেকে পেয়েছি।

সুশীলা—তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস।

রেবতী দৌড়ে বাইরে যায়, একটুবাদেই একটা পাতায় করে সামান্য দই নিয়ে আসে। মা রুটি সেঁকে দেয়। মোহন দই দিয়ে খেতে শুরু করে। সাধারণ ছেলেদের মত সেও স্বার্থপর। বোনকে জিজ্ঞেস করে না আর।

সুশীলা শক্ত চোখে বলে—দিদিকে দে। একাই খেয়ে শেষ করবি ?

মোহন লজ্জা পায়। তার চোখ জোড়া ছলছলে হয়ে ওঠে।

রেবতী বলে—না মা, কতটুকুই বা এনেছি। তুই খা মোহন। তোর বড্ড তাড়াতাড়ি ঘুম পায়। ডাল হোক, আমি পরে খাবো।

ঠিক তখনই দুজন লোক বাইরে ডাকে। রেবতী বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে। এরা সেঠ কুবেরদাসের লোক। বাড়ী খালি করার জন্য এসেছে। ক্রোধে সুশীলার চোখ লাল হয়ে ওঠে।

বারান্দায় এসে বলে—এক মাসও পেরোয়নি আমার স্বামী গত

হয়েছেন, এরি মধ্যে বাড়ী খালি করার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। পঞ্চাশ হাজের বাড়ী ত্রিশ হাজারে নিয়েছে. সেই সঙ্গে পাঁচ হাজার সুদও, তবুও এতটুকু বিশ্বাস নেই। বলে দিও, আমি এখন বাড়ী খালি করতে পারবো না।

মুনীম নম্রস্বরে বলে—আমার কি সাহস বলুন। আমি শুধু খবর বয়ে এনেছি। জিনিষ যখন অপরের হয়েছে, তখন ছেড়ে দিতেই হবে। ঝামেলা করে লাভ কি।

সুশীলা ভেবে দেখে, ঠিকই বলেছে। গো হত্যার।

নরম হয়ে বলে—সেঠজীকে বলো, আমায় পাঁচ-দশ দিন সময় দিক্। আচ্ছা থাক, কিছু বলতে হবে না। মিছিমিছি পাঁচ-দশ দিনের উপকারই বা নেবো কেন? আমার ভাগ্যে যদি এ বাড়ীতে বাস করার কথা থাকতো, তাহলে বাড়ীটা এভাবে যেতো না।

মুনীম বলে—কাল সকালে খালি হয়ে পড়বে!

সুশীলা—হ্যাঁ, বলেছি তো। কাল সকালে কেন, আমি এখনই খালি করে দিচ্ছি। আমার কাছে কি বা এমন জিনিষ-পত্তর আছে। সত্যি তো, তোমার সেঠজীর সারা রাতের ভাড়া মারা যাবে। যাও তালা-টালা নিয়ে এসো, নাকি এনেছো?

মুনীম—এত কিসের তাড়াতাড়ি। কাল দেখে শুনে খালি করে দেবেন।

সুশীলা—কালকের ঝগড়া কেন তুলে রাখবো? মুনীমজী, আপনি আসুন, তালা এনে লাগিয়ে দিন। এই বলে সুশীলা ভেতরে যায়, ছেলেমেয়েকে খাবার খাওয়ায়—একটা রুটি সে নিজে কোন রকমে গলাধঃকরণ করে, বাসন ধোয়, তারপর একটা টাঙা ডেকে নিজের যৎ-সামান্য জিনিষপত্তর রাখে। ভারি হৃদয়ে সেই বাড়ী থেকে চিরকালের মত বিদায় নেয়।

যখন এই বাড়ী তৈরী করেছিল, মনে কতই না আশা-কল্পনা। গৃহ-প্রবেশের সময় হাজার জন ব্রাহ্মণ-ভোজ করিয়েছিল। সুশীলাকে

বড় ছোটাছুটি করতে হয়েছিল, যার ফলে পরে সে মাসাবধি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। এই বাড়ীতেই তার ছুটি ছেলে মারা যায়। এখানেই তার স্বামী মারা যান। মৃতের স্মৃতি জড়ানো এই বাড়ীর প্রতিটি ইট-কাঠ পবিত্র করে তুলেছে। প্রতিটি অংশ যেন তার সুখে আনন্দিত, শোকে দুঃখিত হয়ে উঠেছে। সেই বাড়ী আজ তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

সেই রাত্রে তারা একজন প্রতিবেশীর ঘরে কাটায়, পরদিন দশটাকা মাস একটি গলির ভেতর বাসা ভাড়া করে।

॥ ৫ ॥

নতুন বাড়ীতে এই তিনজন অনাথ কিভাবে কষ্টে দিনযাপন করে, তা যারা বোঝার তারাই বুঝতে পারবে। ভালো হোক সন্তলালের। সে দশ-পাঁচ টাকা দিয়ে সাহায্য করে। সুশীলা যদি দরিদ্র ঘরের কন্যা হতো, তাহলে পরিশ্রমের কাজ করত, কাপড়-সেলাই করত, কারো বাড়ী দেখাশোনা করত; কিন্তু যেসব কাজ সমাজের লোকেরা হীন মনে করে, সেই কাজ সে নেবে কি করে! লোকেরা বলে বেড়াবে, শেঠ রামনাথের স্ত্রী। সেই নামের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখাও প্রয়োজন। সমাজের চক্রব্যূহ থেকে কোন রকমে নিষ্কৃতি নেই। মেয়েটির যাও বা ছু-একটি গয়না অবশেষ ছিল, তাও বিক্রী হয়ে গেছে। ঘরে রুটির এত অভাব, বাড়ীভাড়ার পয়সা জোটাবে কোত্থেকে। তিনমাস পরে বাড়ীওয়ালা—যে তাদের সমাজেরই একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং যিনি মৃতক-ভোজে দরাজ মনে খেয়েছিল —অধীর হয়ে ওঠে। বেচারা কত আর ধৈর্য্য ধরে রাখবে। ত্রিশ টাকার ব্যাপার, এক-আধ টাকা নয়। এত টাকা ছেড়ে দেওয়াও সম্ভব নয়।

অবশেষে একদিন শেঠজী এসে চোখ লাল করে—ভাড়া দিতে না পারলে, ঘর খালি করে দাও। জাত-ভাই বলে আমি এতটা খাতির করেছি। এখন আর কোন রকমে চলতে পারে না।

সুশীলা বলে—শেঠজী, আমার কাছে টাকা থাকলে প্রথমে আপনার ভাড়া মিটিয়ে মুখে জল দিতাম। আপনি এতটা খাতির করেছেন, এইজন্য আমার মাথা আপনার চরণে ; কিন্তু এখন আমি একেবারে খালি হাতে। ধরে নিন, আপনি এক ভাইয়ের ছেলে-মেয়েদের ভরণ-পোষণ করছেন। এ ছাড়া আমি আর কি বলবো।

শেঠ—থামো, এ ধরণের কথা বহু শুনেছি। পেয়েছো জাতভাই অমনি চুষে নেয়ার ফিকির। মুসলমান বাড়ীওয়ালা হলে, চুপচাপ মাসে-মাসে ভাড়া গুনে দিতে, নইলে এতদিন বাড়ী থেকে বার করে দিত। আমি জাতি-সমাজের লোক, তাই বুঝি আমায় ভাড়া দেয়ার দরকার নেই। আমার ভাড়া চাওয়া উচিৎ নয়! সমাজের লোকের সঙ্গে এমন ব্যবহার করাটাই উচিৎ।

ঠিক এই সময় রেবতী এসে দাঁড়ায়। শেঠজী তাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে, তারপর সহসা বলে ওঠে—মেয়ে তো বেশ সেয়ানা হয়ে উঠেছে। তা, বিয়ের কি কথাবার্তা হয়েছে কোথাও ?

রেবতী সঙ্গে-সঙ্গে পালিয়ে যায়। সুশীলা এই কথাকটিতে আন্তরিকতার আভাষ পেয়ে পুলকিত কণ্ঠে বলে—এখনও কোন কথাবার্তা হয়নি সেঠজী। ঘরের ভাড়াই মেটাতে পারছি না, বিয়ের কিবা ব্যবস্থা করবো ; তাছাড়া এখন বয়সও কম।

শেঠজী সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের বচন শোনায়। কন্যাদের বিয়ের এটাই প্রকৃত বয়স। ধর্ম কখনও ত্যাগ করা উচিৎ নয়। না, ভাড়া কোন ব্যাপার নয়। আমার জানা ছিল না, সেঠ রামনাথের পরিবারের এই অবস্থা।

সুশীলা—তা, আপনার সন্ধানে কোন ভালো ছেলে আছে কি! আপনি তো জানেন, পণ-টন দেবার মত আমার কাছে কিছুই নেই।

ঝাবর মল (এই শেঠের নাম)—বরপণের কোন গণ্ডগোল হবে না, বুঝলেন। এমন ঘর, মেয়ে আপনার আজীবন সুখী থাকবে। আপনার ছেলেও তার সাথে থাকতে পারে। বংশ ভালো, সব দিক দিয়ে সম্পন্ন পরিবার। তবে, হ্যাঁ, ছেলে কিন্তু দোজবর।

সুশীলা—দোজবরে কিই বা এসে যায়, বয়সটা মানালেই হলো।

ঝাবরমল—বয়স এমন কিছু বেশী নয়, ধরুন এখন চল্লিশ চলছে তার। কিন্তু দেখতে-শুনতে ভালো, স্বাস্থ্যও ভালো। জোয়ান বয়সের মত খাওয়া-দাওয়া। ধরো, পরিবার উদ্ধার হয়ে যাবে।

সুশীলা অনিচ্ছাভাবে বলে—আচ্ছা, আমি ভেবে জানাবো। একবার ছেলেকে আমায় দেখাতে পারেন।

ঝাবরমল—দেখার জন্য কোথাও যেতে হবে না। সে এখন আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।

সুশীলা ঘৃণা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। পঞ্চাশ বছরের বুড়োর এই ভিমরতি। বুকের মাংস ঝুলে নাভি অব্দি এসে ঠেকেছে, তবুও বিয়ে করার বাসনা। বদমাইশটা ভেবেছে, প্রলোভনে পড়ে আমি মেয়েকে ওর গলায় ঝুলিয়ে দেবো। মেয়েকে বরং আজীবন কুমারী রেখে দেবো; তা বলে এই ঘাটের বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তার জীবন নষ্ট করবো না। সুশীলা কোন রকমে ক্রোধ শান্ত করে। সময়ের হেরফের, নইলে এমন লোকেরা তার কাছে এ ধরণের প্রস্তাব করার সাহস পায় কি করে। সে শান্তস্বরে বলে—আপনার এই দয়াটুকুর জন্য ধন্যবাদ, শেঠজী। কিন্তু মেয়ের বিয়ে আপনার সঙ্গে দিতে পারবো না।

ঝাবরমল—তুমি কি ভাবছো, তোমার মেয়ের জন্য জাত-সমাজে কোন ছেলে পাবে?

সুশীলা—না পাই, আমার মেয়ে বরং কুমারী থাকবে।

ঝাবরমল—রামনাথ বাবুর নাম কলঙ্কিত করবে?

সুশীলা—এমন কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না। নামের

জন্য বাড়ী খুইয়েছি, সম্পত্তি খুইয়েছি ; মেয়েকে কুঁয়োয় ফেলে দিতে পারবো না।

ঝাবরমল—তবে আমার ভাড়া মিটিয়ে দাও।

সুশীলা—এখন আমার কাছে টাকা নেই।

ঝাবরমল ভেতরে ঢুকে সংসারের প্রতিটি বস্তু বাইরে বার করে গলিতে ছুঁড়ে ফেলে। কলসী ভেঙে যায়, হাড়ি ফেটে পড়ে। বাক্সের কাপড় ছড়িয়ে পড়ে। সুশীলা দাঁড়িয়ে তার দুর্দিনের এই ক্রুর ক্রীড়া দেখতে থাকে।

ঘরে এই বিধ্বংস লীলা শেষ করে ঝাবরমল দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেয়, তারপর আদালতে টাকা আদায় করার হুমকি দিয়ে চলে যায়।

॥ ৬ ॥

ধনীদের টাকা পয়সা থাকে, গরীবদের হৃদয়। টাকা পয়সায় বড়-বড় ব্যবসা চালানো যায়, বিশাল প্রাসাদ-মহল গড়া যায়, চাকর-ঠাকুর রাখা যায়, গাড়ী-ঘোড়া করা যায়। হৃদয়ে সমবেদনা হয়, অশ্রু বেরোয়।

সেই বাড়ী সংলগ্ন একটা শাক-তরকারী কাঁচামালের দোকান ছিল। তরকারীউলি বৃদ্ধা, বিধবা, সন্তানহীনা রমণী, বাইরে থেকে আগুন, অথচ ভেতরে জল। ঝাবরমলের কাণ্ড-কারখনা দেখে সে হাজারটা কথা শোনায়, তারপর সুশীলার প্রতিটি বস্তু এক-এক করে নিজের ঘরে নিয়ে তোলে। আমার ঘরে থাক বৌমা। দূরবস্থায় পড়েছি, নইলে ওর গোঁফ উপরে ফেলতাম। মরণ ওর মাথার ওপর নাচছে, না সামনে বাঁধন না পেছনে টান। অথচ টাকা-পয়সার পেছনে মরছে। যেন, যাবার সময় বুকে করে নিয়ে যাবে। তুমি

চলো, আমার ঘরেই থাকবে। আমার কোন আপত্তি নেই। আমি শুধু একা থাকি। আমাকে এক মুঠো দিলেই চলবে।

সুশীলা ভয়ে ভয়ে বলে—মা আমার কাছে সের খানিক আটা ছাড়া আর কিছু নেই। আমি তোমায় ভাড়া দেবো কোত্থেকে?

বৃদ্ধা বলে—বৌমা, আমি ঝাবরমল নই, কুবেরদাসও নই। আমি মনে করি, জীবনে সুখও আছে। সুখে অহঙ্কারী হয়ো না, দুঃখে বিচলিত হয়ো না। তোমাদের কাছ থেকে দু-চার পয়সা উপায় করে নিজের পেট চালাই। তোমাকে সেদিনও দেখেছিলাম, যখন তুমি প্রাসাদে থাকতে, আর আজও দেখছি যখন তুমি একেবারে অনাথ। যে মেজাজ তখন ছিল, আজও তাই। আমার সৌভাগ্য, তুমি আমার ঘরে এসো। আমি কি চোখের মাথা খেয়েছি, তোমার কাছে ভাড়া চাইবো!

সান্ত্বনাময় এই সব সরল কথা সুশীলার হৃদয়ের ভার হাল্কা করে দেয়। সে লক্ষ্য করে, এইসব নীচুতলার দরিদ্র লোকেদের কাছেই অকপট ভদ্রতা পাওয়া যায়। ধনীদের দয়া দেখানো, কিছুটা অহঙ্কারেরই রূপ।

এই তরকারীউলির কাছে সুশীলার ছ'মাস কাটে। দিন-দিন তাঁর প্রতি সুশীলার মায়া-মমতা-ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। সে যা কিছু পায়, এনে সুশীলার হাতে তুলে দেয়। ছেলে-মেয়ে দুটি ক্রমশঃ তার চোখের মণি হয়ে ওঠে। সাহস কি, প্রতিবেশী কেউ তাদের দিকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলে। বৃদ্ধা একেবারে পাড়া মাথায় করে ফেলে। সন্তলাল প্রতিমাসে কিছু-কিছু হাতে ধরে দেয়। তা দিয়ে কোন রকমে ডাল-রুটি জুটে যায়।

কার্তিক মাস—জ্বরের প্রকোপ ছড়িয়ে পড়ে। মোহন একদিন জ্বরে পড়ে। তিনদিন যাবৎ একেবারে অচেতন হয়ে পড়ে থাকে। জ্বর এত তীব্র হয়ে ওঠে, কাছে দাঁড়ালে তাপ এসে লাগে। বৃদ্ধা দেখে শুনে, ওঝা-গুণীণের কাছে ছুটে যায়; কিন্তু জ্বর নামার কোন

লক্ষণ দেখা দেয় না। সুশীলার আশঙ্কা হয়, হয়তো এটা টাইফয়েড। ভয়ে তার প্রাণ শুকিয়ে যায়।

চতুর্থ দিনে সে রেবতীকে বলে—খুকু, তুই তো 'বড়পঞ্চে'র বাড়ী দেখেছিস। গিয়ে তাঁকে বল—ভাই জ্বরে ধুক্‌ছে, একজন ডাক্তার পাঠিয়ে দিন।

রেবতীকে বলা মাত্র দেরী, সে দৌড়ে শেঠ কুবেরদাসের কাছে গিয়ে হাজির হয়।

কুবেরদাস বলে—ডাক্তারের ফি ষোল টাকা। তোর মা দেবে কি?

রেবতী নিরাশ হয়ে বলে—মার কাছে টাকা কোথায়?

কুবের—তাহলে কোন মুখে ডাক্তার ডেকে পাঠায়। তোর মামা কোথায়? ওকে গিয়ে বল, সেবা-সমিতি থেকে কোন ডাক্তার নিয়ে যাক্, নইলে দাতব্য হাসপাতালে ছেলেকে নিয়ে যায় না কেন? নাকি, এখনও সেই পুরনো গোঁ আঁকড়ে আছে। কেমন মূর্খ মেয়েমানুষ, ঘরে যার পয়সা নেই অথচ ডাক্তার আনতে হুকুম দিয়ে বসেছে। ভেবে বসেছে, ফি বুঝি পঞ্চ-রা দেবে। পঞ্চ ফি দেবে কেন? সমাজের লোকেদের টাকা-পয়সা ধর্মকাজের জন্য, ওড়াবার জন্য নয়।

রেবতী ফিরে আসে মার কাছে, যা কিছু শুনেছিল, তা আর বলতে পারে না। কাটা ঘায়ে আর নুন ছড়ানো কেন। অজুহাত দেখায়; বড়-পঞ্চ কোথায় যেন বেরিয়ে গেছেন।

সুশীলা—মুনিমকে বললি না কেন? এখানে কি মেঠাই খাওয়া হচ্ছে অমনি দৌড়ে ফিরে এলি?

এই সময় সন্তলাল একজন কবিরাজকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হয়।

## ॥ ৭ ॥

একদিন এসে পরদিন আর কবিরাজ আসে না। সেবা-সমিতির ডাক্তারকে দুদিন খুবই কাকুতি-মিনতি করার পর আসে। তারপর, তাঁর আর সময় হয়ে ওঠে না, এদিকে মোহনের অবস্থা দিন-দিন খারাপ হয়ে চলে। এক মাস পেরিয়ে যায়, কিন্তু জ্বর সেই রকম চেপে থাকে। একটুও কমে না। মুখখানি এমন শুকিয়ে গেছে যে দেখলে বড় মায়া হয়। কিছু বলে না, কোন কথা নয়, এমন কি পাশ ফিরতেও পারে না। পড়ে-পড়ে শরীরের চামড়া ফেটে গেছে, মাথার চুল ঝরে পড়েছে। হাত-পা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সন্তলাল কাজ থেকে ছুটি পেলে এসে দেখে যায়, তাতে আর কি, সে তো আর রোগ হরণ ওষুধ নয়।

একদিন সন্ধ্যার দিকে মোহনের হাত ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। মা'র প্রাণ আগেই শুকিয়ে গেছিল। এই অবস্থা দেখে কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। বহু মানত করেছিল, কাঁদতে কাঁদতে মোহনের খাটে সাত পাক দিয়ে হাত জোড় করে বলে—হে ভগবান! এই আমার জন্মের আয়। আমার সর্বস্ব খুইয়েও আমি ছেলেকে বুকে আঁকড়ে সন্তুষ্ট ছিলাম; কিন্তু এই আঘাত সহ্য করতে পারবো না। তুমি একে সুস্থ করে তোল। পরিবর্তে আমায় গ্রহণ করো। আমি শুধু এটুকু দয়া চাই, হে দয়াময়।

সংসারের রহস্য কে বুঝতে পারে? আমাদের মধ্যে অনেকের এ ধরণের অভিজ্ঞতা কি হয়নি—যেদিন বেইমানি করে কিছু টাকা মেরেছি, সেদিনই সেই টাকার দ্বিগুণ লোকসান হয়ে গেছে। সুশীলার সেই রাত্রে জ্বর চাপে, এবং সেদিনই মোহনের জ্বর নেমে যায়। ছেলের সেবা শুশ্রূষায় শরীর অর্দ্ধেক হয়ে পড়েছিল, এখন এই রোগ তাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে যে আর ছাড়ার নাম নেই।

হয়তো ভাগবান তার প্রার্থনা শুনেছিল, যা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়। পনরো দিনের মাথায় মোহন বিছানা থেকে উঠে মা'র কাছে এগিয়ে যায়, এবং তার . বুকে মাথা রেখে কাঁদতে থাকে। মা তার পিঠে হাত রেখে বুকে টেনে নেয়, বলে—কেন কাঁদছিস খোকা! আমি ভাল হয়ে যাবো। এখন আমার কিসের চিন্তা। ভগবান আমাদের প্রতিপালন করেন। তিনিই তোমার রক্ষাকর্তা। তিনিই তোমার পিতা। এখন আমি সব দিক থেকে নিশ্চিন্ত। তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবো।

মোহন বলে—দিদা বলছিল, মা আর ভাল হবে না।

সুশীলা ছেলের মাথায় চুমু খেয়ে বলে—দিদা একটা পাগল, বলতে দে ওঁকে। আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। আমি সব সময় তোর সঙ্গে থাকবো। তবে, যেদিন তুই অপরাধ করবি, কোন জিনিষ তুলে নিয়ে আসবি, সেদিন আমি সত্যি-সত্যি মরে যাবো!

মোহন খুশী হয়ে বলে—তাহলে তুমি আমায় কখনও ছেড়ে যাবে না তো মা?

সুশীলা বলে—কক্ষনো নয় খোকা, কক্ষনো নয়।

সেই রাত্রেই অনাথ বিধবা তার অনাথ ছেলেমেয়েকে বিধাতার হাতে রেখে ইহলোক ত্যাগ করে।

॥ ৮ ॥

এই ঘটনার তিন বছর পার হয়েছে; মোহন ও রেবতী সেই বৃদ্ধার কাছে থাকে। বৃদ্ধা তাদের মা নয়, কিন্তু মায়ের চেয়েও বড়। প্রতিদিন সে রাতে-রাখা রুটি খাইয়ে মোহনকে গুরুমশায়ের পাঠশালায় পৌঁছে দেয়। ছুটির পর গিয়ে তাকে নিয়ে আসে।

রেবতী এখন চৌদ্দ বছরে পড়েছে। বাড়ীর সব কাজকর্ম—কুটনো কোটা, রান্নাবান্না, বাসন মাজা, ঝাঁট দেয়া, ধোয়া মোছা পরিষ্কার করা—সব সে করে। বৃদ্ধা কাঁচাতরকারী বিক্রী করতে বেরোলে, সে দোকানে এসেও বসে।

একদিন বড় পঞ্চ সেঠ কুবের দাস তাকে ডেকে পাঠায়, বলে—দোকানে বসতে তোর লজ্জা করে না, গোটা সমাজের নাক কাটছিস? খবরদার, কাল থেকে যেন দোকানে না বসিস। তোর বিয়ে আমি ঝাবরমলের সঙ্গে পাকা করেছি।

শেঠগিন্নী সমর্থন করে—তুই এখন বড় হয়েছিস মেয়ে, এখন তোর এভাবে দোকানে বসা ঠিক নয়। লোকেরা নানা ধরণের কথা বলে। শেঠ ঝাবরমল রাজী হতে চাইছে না, আমরাই অনেক বলে কয়ে রাজী করিয়েছি। ধরে নে, এবার থেকে তুই রানী হয়ে থাকবি। লাখের ওপর সম্পতি, বুঝলি অনেক টাকা। তোর ভাগ্য ভালো, এমন বর জুটেছে। তোর ছোট ভাইকেও একটা দোকান করে দেবে।

শেঠ—জাত-ভাইদের বদনাম কম নয়।

শেঠগিন্নী—তা তো বটেই।

রেবতী লজ্জা পেয়ে বলে—আমি জানি না, আপনি মামাকে বলুন!

শেঠ ( রেগে উঠে )—সে কে! মাস মাইনের সরকারী করে। ওকে কি জিজ্ঞেস করবো? আমি হলাম গে জাত ভাইয়ের পঞ্চ। আমার অধিকার আছে, যে কাজ জাত-ভাইয়ের কল্যাণ হবে—তা আমি করবো। আমি অন্য সব পঞ্চদের কাছ থেকে মতামত নিয়েছি। সকলেই আমার সঙ্গে একমত। যদি তুই রাজী না হোস, তাহলে আদালতের মারফৎ করতে হবে। নে, তোর খরচ-টরচ আছে, এটা নিয়ে যা।

এই বলে সে রেবতীর দিকে কুড়ি টাকার নোট ছুঁড়ে দেয়।

রেবতী নোট তুলে সেখানেই কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে, তারপর লাল টকটকে মুখে বলে ওঠে—জাতভাই! আমরা যখন রুটির জন্য মুখ চেয়ে থাকতাম, তখন এই জাতভাইরা আমাদের খোঁজ খবর নেয়নি। আমার মা মারা যায়, কেউ উঁকি মেরেও দেখতে আসেনি। আমার ভাই রোগে পড়ল, কেউ এসে খবরটুকুও নেয়নি। এমন জাত-ভাইদের আমি কোন পরোয়া করি না।

রেবতী চলে যেতে, ঝাবরমল ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। চেহারা উদাস।

সেঠ' গিন্নী বলে—মেয়েটা বড় দেমাগী। চোখের জল শুকিয়ে গেছে।

ঝামরমল—কুড়ি টাকা জলে গেল। এমন করে ছিঁড়েছে যে আর জোড়া দেয়ার উপায় নেই।

কুবের দাস—তুমি মন খারাপ করো না; আমি আদালতে ঠিক করে দেবো। যাবে কোথায়।

ঝাবরমল—এখন আপনার ওপরেই ভরসা।

জাত-সমাজের বড় পঞ্চের কথা কি কখনও মিথ্যে হতে পারে? রেবতী অপ্রাপ্তবয়স্কা। বাপ-মা নেই। এমন অবস্থায় তার ওপর পঞ্চদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সে জাত-সমাজের চাপে থাকতে চায় না, না থাক্। কিন্তু আইন তো আর জাত-সমাজের অধিকার উপেক্ষা করতে পারবে না।

সন্তলাল এই ব্যাপার শুনে, দাঁত কামড়ে বলে—কবে যে ভগবান এই জাত-সমাজের নিগ্রহ শেষ করবে।

রেবতী—সমাজের লোকেরা কি আমায় জোর করে নিজের অধিকারে আনতে পারে?

সন্তলাল—তা পারে, ধনীদের হাতেই যে আইন।

রেবতী—আমি যদি বলি, ওর সঙ্গে আমি থাকতে চাই না।

সন্তলাল—তোর বলায় কি আসে যায়। ভাগ্যে তোর এটাই

লেখা, কি আর করা যাবে। দেখি, 'বড় পঞ্চ' এর কাছে একবার যাই।

রেবতী—না মামাবাবু, তুমি কোথাও যেও না। ভাগ্যের ওপরেই যখন ভরসা, যা কিছু ভাগ্যে আছে তা ঘটবে।

রাত রেবতী ঘরে কাটায়। বার বার নিদ্রামগ্ন ভাইটিকে জড়িয়ে ধরে। এই অনাথ একা থাকবে কি করে--এই ভেবে তার মন কাতর হয়ে ওঠে; কিন্তু ঝাবরমলের চেহারা মনে করে সংকল্প দৃঢ় করে।

সকালে রেবতী গঙ্গা-স্নান করতে যায়। ইদানীং ক'মাস ধরে তার প্রতিদিনের নিয়ম। আজ সামান্য অন্ধকার; কিন্তু সন্দেহের কোন কারণ ছিল না। সন্দেহ জাগে, যখন আটটা বাজে এবং সে ফিরে আসে না। তিন-পহরে, সমগ্র সমাজে জ্ঞাতি-কুটুম্বে খবর ছড়িয়ে পড়ে—সেঠ রামনাথের কন্যা গঙ্গায় ডুবে গেছে। তার লাশ ভেসে উঠেছে।

কুবের দাস—যাক্ ভালোই হলো; সমাজের বদনাম হবে না।

ঝাবরমল দুখী মনে বলে—আমার জন্য এবার অন্য কোন উপায় বার করুন।

ওদিকে মোহন মাথা চাপড়ে কাঁদতে থাকে, বৃদ্ধা তাকে কোলে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে থাকে—দাদুভাই, দিদির জন্য কাঁদছো কেন? জীবনে শুধু দুঃখু আর দুঃখু। এবার মার কোলে শুয়ে আরাম করুক।

## বন্দী

চৌদ্দ বছর ধরে অবিরাম বেদনা ও শারীরিক যাতনা ভোগ করার পর আইভান ওখোটস্ক জেল থেকে বেরিয়ে আসে; কিন্তু সেই পাখীর মত নয়—শিকারীর খাঁচা থেকে যে ডানাহীন হয়ে বেরোয়। বরং বলা চলে সেই সিংহের মত—জেলের দেয়াল যাকে আরও

ভয়ঙ্কর, আরও রক্তলোলুপ করে তোলে। তার অন্তঃস্থলে এক জ্বালা যার উত্তাপে তার বলিষ্ঠ শরীর, সুদৃঢ় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং কল্পনাময় অভিলাষ ঝল্‌সে উঠছিল। আজ তার অস্তিত্বের প্রতিটি অনুময়ে অগ্নিকণা সৃষ্টি হয়ে পড়েছিল—ক্ষুধিত, চঞ্চল এবং বিদ্রোহী।

জেলার তার ওজন নেয়। জেলে ঢোকার সময় ওজন ছিল দু মণ তিন সের, আজ মাত্র একমণ পাঁচ সের।

সহানুভূতি জানিয়ে জেলার বলে—তুমি বেশ দুর্বল হয়ে গেছ, আইভান! সামান্য কুপথ্য হলে, তোমার কিন্তু অবনতি ঘটবে।

আইভান গর্বভরে তার শরীর হাড়ের খাঁচা দেখে, সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভেতর এক অগ্নিময় প্রবাহের অনুভব করে বলে—কে বলে দুর্বল হয়ে গেছি?

'তুমি নিজেই বুঝতে পারছো।'

'বুকের আগুন যতক্ষণ না মিটবে, আইভান কক্ষনোও মরবে না মিঃ জেলার, বিশ্বাস করুন, এক'শ বছরেও না।

আইভান এই ধরনের প্রলাপ বকত; তাই জেলার বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। সকলেই তাকে অর্ধ-বিক্ষিপ্ত মনে করত। লেখা-লিখির ব্যাপার সারার পর, তার পোযাক বই নিয়ে আসা হয়; কিন্তু আগেকার স্যুট এখন শরীরে ঢিলে-ঢালা হয়ে পড়ে। কোর্টের পকেট থেকে কিছু নোট বেরোয়, কিছু নগদ রুবল্‌। সব কিছু সে জেলের ওয়ার্ডার এবং নিম্ন কর্মচারীদের মধ্যে বিলি করে দেয়—যেন কোন রাজ্য জয় করেছে সে।

জেলার বলে—এ হতে পারে না আইভান! তুমি সরকারী লোকদের ঘুষ দিতে পারো না।

আইভান সরল হাসিতে হেসে ওঠে—এটা ঘুষ নয়, মিঃ জেলার। এদের ঘুষ দিয়ে আমি কি আর আদায় করবো? এরা অখুশী হয়ে আমার আর কি ক্ষতি করবে, খুশী হয়েই বা কি সুযোগ করে দেবে

আমায় ? এটা সেই দয়াটুকুর জন্য ধন্যবাদ জানানো, যার অভাবে চৌদ্দ বছর কেন, আমার এখানে চৌদ্দ ঘণ্টা টিঁকে থাকা দুঃসহ মনে হতো।

জেলের ফটক থেকে সে বেরিয়ে এলে, জেলার এবং অন্যান্য কর্মচারীরা তাকে মোটর ওব্দি পৌঁছে দিতে আসে।

পনরো বছর পূর্বে আইভান মস্কোর এক সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত বংশের প্রদীপ-স্বরূপ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা পেয়েছে, খেলাধূলায় পারদর্শী এবং নির্ভীক। সেই সঙ্গে উদার ও সহৃদয়বান। আয়নার মত হৃদয় তার স্বচ্ছ-নির্মল, স্থির মস্তিষ্ক, দুর্বলদের রক্ষা করার জন্য জীবন বিপন্ন করতে প্রস্তুত, সংকটকালে যার সাহস খোলা তরবারীর মত ঝল্‌সে উঠত। তার সঙ্গে হেলেন নামে এক যুবতী পড়তো, যার জন্য বিদ্যালয়ের প্রতিটি যুবক প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সে যেমন রূপসী, তেমনি ধারালো। কল্পনা প্রবণ ; অথচ নিজের মনের ভাব বন্ধ করে রাখে। আইভানের মাঝে সে কি দেখে যে আকর্ষিত হলো, বলা কঠিন। দুজনের মধ্যে লেশ মাত্র সামঞ্জস্য ছিল না। আইভান ভ্রমণ ও মদ্যপান ভালবাসে ; হেলেন কবিতা, গান এবং নাচের প্রতি আসক্ত। আইভানের ধারনায় টাকা কেবল দুহাতে ওড়ানোর জন্য, হেলেন অত্যন্ত কৃপণ স্বভাবের। আইভানের কাছে লেকচার হল কারাগারের মত মনে হতো ; হেলেন ছিল এই সমুদ্রের মাছ। এই অসমতা তাদের মাঝে স্বাভাবিক আকর্ষণ গড়ে তোলে, পরিশেষে যা সুষ্ঠু প্রেমের রূপ নেয়। আইভান তাকে বিয়ের প্রস্তাব জানায়, এবং তাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নেয়। কোন এক শুভ মুহূর্তে তারা পানিগ্রহণ করে মধুচন্দ্রিকা যাপনের জন্য পাহাড়ি জায়গায় যাবার

মনস্থির করছিল, এমন সময় সহসা রাজনৈতিক সংগ্রাম তাদের নিজের কাছে টেনে আনে। হেলেন আগে থেকেই রাষ্ট্রবাদিদের প্রতি ঝুঁকে ছিল। আইভানও সেই রঙে রাঙা হয়ে ওঠে। ধনী-বংশের সন্তান, তাই প্রজা-পক্ষ গ্রহণ করা তার পক্ষে মহান তপস্যা ছিল ; ফলে মাঝে মাঝে যখন সে এই সংগ্রামে হতাশ হয়ে পড়ত, হেলেন তখন তাকে শক্তি জোগাতো। আইভান তার সাহস ও অনুরাগে প্রভাবিত হয়ে নিজের দুর্বলতার ওপর লজ্জিত হয়ে উঠত।

এই সময় উক্রায়েন প্রান্তের সুবেদারীতে রোমনাফ নামে একজন গভর্নর নিযুক্ত হয়ে আসে—খুবই গোঁড়া, বিপ্লবীদের ঘোর শত্রু, দিনে দু-চারজন বিদ্রোহীকে জেলে না পাঠানো পর্যন্ত সে শান্তি পায় না। আসার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন সম্পাদকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ এনে সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দেয়, কৃষকদের সভা ভণ্ডুল করে, শহরের মিন্যুসিপালিটি ভেঙ্গে দেয়। জনসাধারণ যখন প্রতিবাদ জানানোর জন্য সভার আয়োজন করে, তখন পুলিশ দিয়ে ভিড়ের মাঝে গুলি-চালনা করে—যার ফলে কয়েকজন নিরপরাধীর প্রাণ বিনষ্ট হয়। মার্শাল-ল জারী করা হয়। গোটা শহরে হাহাকার ছড়িয়ে পড়ে। ভয়ে আতঙ্কে লোকেরা ঘর থেকে বেরোয় না ; পুলিশ সকলের তল্লাশী নেয়, ধরে মারধোর করে।

হেলেন কঠোর ভঙ্গিতে বলে—এই অরাজকতা যে একেবারে সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে, আইভান। এর প্রতিকার করা দরকার।

আইভান জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়—প্রতিকার! আমরা কি করতে পারি ?

হেলেন তার জড়তায় খিন্ন হয়ে বলে—তুমি বলছ, আমরা কি করতে পারি ? আমি বলছি, আমরা সবকিছু করতে পারি। আমি এই হাত দিয়েই শেষ করে ফেলতে পারি।

আইভান বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে থাকে—তুমি ভাবছো, ওকে

হত্যা করা সহজ ? জানো, ও কখনও খোলা গাড়ীতে বেরোয় না। সামনে পেছনে সব সময় সশস্ত্র সৈন্যের একটা দল মোতায়েন থাকে। রেলগাড়ীতেও সে রিজার্ভ কামরায় ভ্রমণ করে। আমার কাছে এটা অসম্ভব মনে হয়, হেলেন, একেবারে অসম্ভব।

হেলেন মিনিট কয়েক ধরে চা তৈরী করে। তারপর, দুটো পেয়ালা টেবিলের ওপর রেখে সে পেয়ালা মুখের কাছে আনে, ধীরে-ধীরে চা খায়। যেন কোন ভাবনায় তন্ময় হয়ে পড়ে। সহসা সে টেবিলের ওপর পেয়ালা রাখে, তারপর বড় বড় চোখ ঝলসিয়ে বলে ওঠে—এত সবের মধ্যে আমি ওকে হত্যা করতে পারি আইভান। যে কোন মানুষ একবার নিজের হাতে চ্যালেঞ্জ নিয়ে সবকিছু করতে পারে। জানো, আমি কি করবো ? আমি ওর সঙ্গে আলাপ-সম্পর্ক পাতাবো, ওর মনে একটা ধারণা গড়ে তুলবো, আমি ওকে এমন ভ্রান্তিতে ফেলবো যেন ওর প্রতি আমার প্রেম আছে। মানুষ যতই হৃদয়হীন হোক না কেন, তার হৃদয়ে কোন এক প্রান্তে পরাগের মত রস লুকনো থাকে। আমার মনে হয়, রোমনাফের এই যে দমন-নীতি তা ওর অবরুদ্ধ অভিলাষের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। নিশ্চিত কোন মায়াবিনীর প্রেমে অসফল হয়ে ওর হৃদয়ের রক্তস্রোত শুকিয়ে গেছে। সেখানে রসের সঞ্চার করতে হবে। যে কোন যুবতীর মধুর শব্দ, সরল হাসি এই রস সঞ্চার যাদুর কাজ করে। এ ধরনের পুরুষদের যুবতীরা খুব সহজেই নিজের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসাতে পারে। অবশ্য তোমার মত খেয়ালীদের মুগ্ধ করা এর চেয়ে কঠিন কাজ। যদি তুমি স্বীকার করো আমি রূপহীনা নই, তাহলে তোমাকে এটুকু বিশ্বাস দিতে পারি আমার কার্যসিদ্ধি হবে। বল, আমি রূপবতী কিনা ?

বলেই তীর্যক চোখে আইভানের দিকে চায়। আইভান এই ভাব-বিলাসে মুগ্ধ হয়ে বলে—তুমি আমার কাছে জানতে চাইছো, হেলেন ? তোমায় আমি পৃথিবীর সর্ব···

হেলেন তার কথায় বাধা দিয়ে বলে—যদি তুমি এমন ভেবে থাকো, তাহ্‌লে তুমি মূর্খ, আইভান। এই শহরেই, না, আমাদের স্কুলেই, আমার চেয়েও অনেক রূপসী আছে। অবশ্য, তুমি এটুকু বলতে পারো আমি কুরূপা নই। তুমি কি মনে করো, আমি তোমাকে পৃথিবীর সবচেয়ে রূপবান যুবক মনে করি? কক্ষনো নয়। একজন নয়, আমি এমন একশ জনের নাম উল্লেখ করতে পারি, যারা চেহারায়-স্বাস্থ্যে-সম্পদে তোমার চেয়ে শ্রেয়; কিন্তু তোমার মাঝে এমন একটা জিনিষ আছে যা শুধু তোমার মাঝেই আছে, অন্য কারো মাঝে আমি তা দেখি না। এবার তাহলে আমার কর্মসূচী শোনো। একটা মাস ওর সঙ্গে আমার আলাপ করতে কাটবে। তারপর, সে আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরোবে। তখন একদিন আমি আর সে দুজনেই রাত্রে পার্কে যাবো, জলের ধারে বেঞ্চের ওপর বসবো। তুমি ঠিক সেই সময় রিভালবার নিয়ে এসে পড়বে, এবং সেখানেই পৃথিবী তার ভার-মুক্ত হয়ে হাল্কা হবে।

আমি আগে বলেছি আইভান এক ধনীপুত্র ছিল, বিপ্লবময় রাজনীতিতে তার আন্তরিক প্রেম ছিল না। হেলেনের প্রভাবে অবশ্য কিছুটা মানসিক সহানুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল, এবং মানসিক সহানুভূতি কখনও প্রাণ সংকটে ফেলে না। প্রকাশ্যভাবে সে কোন আপত্তি জানায় না; কিন্তু কিছুটা সন্দিগ্ধভাবে বলে—একটু ভেবে দেখো হেলেন, এভাবে হত্যা করাটা কি মানসিক কৃতি বলে মনে হয়?

হেলেন সুতীক্ষ্ণস্বরে বলে ওঠে—যে লোক অপরের সঙ্গে মানবিক ব্যবহার করে না, তার সঙ্গে আমরাই বা কেন মানবিক ব্যবহার করবো? দিনের মত আজ এ কি স্পষ্ট নয়, শ'য়ে শ'য়ে পরিবার এই রাক্ষসের হাতে নাজেহাল হচ্ছে? কে জানে, কত নিরপরাধীর রক্তে এর হাত রাঙা হয়েছে? এমন লোকের সঙ্গে কোন রকমে রেয়াৎ করা অসঙ্গত। তুমি কেন যে এত ঠাণ্ডা জানি না। আমি যখন তার

অন্যায় দেখি, আমার রক্ত টগবগ করতে থাকে। সত্যি বলছি, যখন তার গাড়ী বেরোয়, আমার প্রতিটি অনু-পরমাণু প্রতিহিংসার আবেগে কাঁপতে থাকে। যদি আমার সামনে কেউ তার গায়ের চামড়া তুলে নেয়, তবুও আমার দয়া হবে না। তোমার যদি এত সাহস না থাকে, কোন ক্ষতি নেই। আমি নিজেই সব করে নেবো। হ্যাঁ, দেখে নিও, ঐ কুকুরটাকে আমি কি করে জাহান্নামে পাঠাই।

হেলেনের মুখ প্রতিহিংসার আবেগে লাল হয়ে ওঠে। আইভান লজ্জিত হয়ে বলে ওঠে—না—না, এ ব্যাপার নয়, হেলেন। আমার তাৎপর্য এই নয় যে আমি তোমায় সহযোগিতা করবো না। আজ আমি জানতে পারলাম তোমার আত্মা দেশের দুর্দশায় কতখানি মর্মাহত ; তবুও আমি আবার বলছি, এ কাজ ততটা সহজ নয় এবং আমাদের খুব সাবধানে কাজ করতে হবে।

হেলেন তার কাঁধে হাত রেখে বলে—এর জন্য তুমি কিছু ভেবো না, আইভান। পৃথিবীতে যে বস্তু আমার সবচেয়ে প্রিয়, তাকে বাজি ধরে আমি কি সাবধানে কাজ করবো না? কিন্তু তোমার কাছে আমার একটিমাত্র প্রার্থনা ; যদি আমি এর মাঝে এমন কোন কাজ করি—যা তোমার খারাপ মনে হয়, আমায় ক্ষমা করবে তো?

আইভান বিস্মিত চোখে হেলেনের মুখের দিকে তাকায়। তার কথার অর্থ সে বুঝতে পারে না।

হেলেন ভয় পায়। আইভান কোন নতুন আপত্তি দাঁড় করাতে চায় না কি। আশ্বাসের জন্য তার মুখ আইভানের আতুর ঠোঁটের সন্নিকটে নিয়ে গিয়ে বলে—প্রেমের অভিনয় করার জন্য আমায় সেইসব করতে হবে, যার অধিকার একমাত্র তোমারই আছে। ভয় হয়, পাছে তুমি আমায় ভুল না বোঝ।

আইভান তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে—এটা অসম্ভব হেলেন। জানোই তো, বিশ্বাস হলো প্রেমের প্রথম ধাপ!

শেষ শব্দকটা উচ্চারণ করতে করতে তার চোখ আনত হয়ে পড়ে।

এই শব্দসমূহে যে আদর্শ আছে, তা সে মান্য করবে কিংবা করবে না—ভাবতে থাকে।

এর তিনদিন পরেই নাটকের সূত্রপাত হয়। তার প্রতি পুলিশের কারণহীন সন্দেহের ফরিয়াদ নিয়ে হেলেন রোমনাফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তাকে জানায়, পুলিশ অফিসার তার প্রতি অসন্তুষ্ট, কারণ সে তাদের কুৎসিত প্রস্তাব ছুঁড়ে ফেলেছে। অবশ্য এও সত্য, বিদ্যালয়ে কয়েকজন উগ্র যুবকের সঙ্গে তার মেলামেশা হয়েছিল; কিন্তু বিদ্যালয় থেকে বেরোবার পর তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। রোমনাফ যতটা ধূর্ত, তার চেয়েও বেশী ধূর্ত মনে করত নিজেকে। তার দশ বছরের চাকরি-জীবনে এমন কোন নারীর মুখোমুখি হয় নি যে তাকে বিশ্বাস করে অনুগ্রহের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। হেলেনের কাছ থেকে সেই সব উগ্র যুবকদের সম্পর্কে বহু তথ্য-সংবাদ জেনে আনন্দে ডগমগ হয়ে ওঠে, ধারণা করে, গোয়েন্দা পুলিশেরা মাথা কুটে মরলেও এতসব উদ্ধার করতে পারত না। কিন্তু, এই সকল তথ্যে মিথ্যের কতখানি মিশ্রণ ছিল, তা সে টের পায় না। আধ ঘণ্টায় একজন যুবতী তার রূপের মদিরায় একজন অভিজ্ঞ অফিসারকে উন্মত্ত করে তুলেছিল।

হেলেন বেরোতে যাচ্ছে, রোমনাফ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলে—আশাকরি, এটা আমাদের শেষ সাক্ষাৎ নয়।

হেলেন হাত এগিয়ে দিয়ে বলে—স্যার, আপনি যে সৌজন্যভরে আমার বিপদের কথা শুনেছেন, তার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

'আপত্তি না থাকলে, কাল আপনি বিকেলে আমার সঙ্গে চা খাবেন।'

ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। হেলেন ফিরে এসে রোজকার কথা আইভানকে শোনায়। রোমনাফের যতটা দুর্নাম ছিল, ততটা মন্দ সে নয়, বরং বেশ রসিক। সঙ্গীত ও শিল্প প্রেমিক, সেই

সঙ্গে সৌজন্য ও বিনয়ের প্রতিমূর্তি। এই ক'দিনেই হেলেনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা প্রবল হয়ে পড়ে, এবং কোন অজ্ঞাত কারণে শহরে পুলিশী অত্যাচার হ্রাস পেতে থাকে।

অবশেষে সেই নির্দিষ্ট দিন এগিয়ে আসে। আইভান ও হেলেন সারাদিন বসে এই প্রশ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করে। আইভানের মন আজ বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সে কখনও অকারণে হেসে ওঠে কখনও বা অনায়াসে কেঁদে ফেলে। শঙ্কা, প্রতীক্ষা এবং কোন অজ্ঞাত দুশ্চিন্তায় তার মনোসাগর এতদূর অশান্ত হয়ে উঠেছে যে, তাতে ভাবনার নৌকা টলমল করতে থাকে—পথের ঠিক-ঠিকানা নেই, দিকেরও নির্দেশ নেই। হেলেনও আজ বড় চিন্তিত এবং গম্ভীর। আজকের উপলক্ষ্যে সে আগে থেকে খুবই আকর্ষণীয় পোষাক তৈরী করেছে। রূপ অলঙ্কৃত করার জন্য নানাধরণের প্রসাধনী ব্যবহার করেছে, তবুও তার মাঝে কোন যোদ্ধার উৎসাহ নেই।

সহসা আইভান চোখে অশ্রু ছাপিয়ে বলে ওঠে—আজ তুমি বড় মায়াবিনী হয়ে উঠেছ হেলেন, কেন জানি আমার ভয় করছে।

হেলেন হেসে ওঠে। সেই হাসিতে করুণা মেশানো—মানুষকে মাঝে মাঝে বড় অপ্রিয় কর্তব্য পালন করতে হয় আইভান, আজ আমি সুধা দিয়ে বিষের কাজ আদায় করতে যাচ্ছি। অলঙ্কারের এমন অপব্যবহার তুমি অন্য কোথাও দেখেছ ?

আইভান বিক্ষিপ্ত মনে বলে—একেই রাষ্ট্রজীবন বলে।

'না এটা রাষ্ট্রজীবন নয়—এটা নরক।'

'কিন্তু পৃথিবীতে এখনও কিছুদিন এর প্রয়োজন পড়বে ।

'এই অবস্থা যত দ্রুত বদলে যায়, ততই মঙ্গল।'

পাশার দান পালটে গেছিল, আইভান উষ্ণ হয়ে বলে ওঠে— অত্যাচারীদের পৃথিবীতে বাড়তে দেয়া হোক, যাতে একদিন এঁদের কাঁটার প্রাচুর্য্যে পৃথিবীর ওপর কোথাও পা রাখার জায়গা থাকবে না।

হেলেন কোন জবাব দেয় না ; কিন্তু তার মনে যে অবসাদ জন্ম নেয়, তা তার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে। তার দৃষ্টিতে রাষ্ট্র সর্বোপরি ছিল, রাষ্ট্রের সামনে ব্যক্তির কোন মূল্য নেই। এ সময় তার মন কোন কারণে দূর্বল হয়ে পড়লেও, প্রকাশ করার সাহস তার মাঝে নেই।

তুজনে আলিঙ্গন সেরে বিদায় নেয়। কে জানে, এটাই শেষ দেখা কিনা! তু-জনের হৃদয় ভারি, তু-জনের চোখ সজল।

আইভান উৎসাহভরে বলে—আমি ঠিক সময়ে এসে পড়বো।

হেলেন কোন জবাব দেয় না।

আইভান পুনরায় সানুরোধে বলে—ঈশ্বরের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা করো, হেলেন।

হেলেন যেন কান্নামিশ্রিত গলায় বলে—ঈশ্বরের প্রতি আমার ভরসা নেই।

'আমার আছে।'

'কবে থেকে ?'

'যবে থেকে মৃত্যু আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।'

হেলেন দ্রুতবেগে বেরিয়ে পড়ে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে এবং তু-ঘণ্টা পরেই সেই কঠিন পরীক্ষার সময় এসে পড়বে—যার জন্য তার প্রাণ কাঁপছিল। সে কোথাও একা-একা বসে ভাবতে চাইছিল। আজ সে বুঝতে পারে সে স্বাধীন নয়। বিরাট মোটা শেকল তার প্রতিটি অঙ্গে আঁকড়ে আছে। এ সে ভাঙ্গবে কি করে ?

দশটা বেজে গেছে। হেলেন ও রোমনাফ পার্কের একটি কুঞ্জে বেঞ্চের ওপর বসে আছে। তীব্র বরফ-বাতাস বইছে। ক্ষীণ আশার মত চাঁদ মেঘের আড়ালে লুকিয়ে আছে।

হেলেন ইতঃস্তত সশঙ্ক দৃষ্টিতে দেখে বলে—অনেকক্ষণ হয়ে গেছে ; এবার আমাদের ওঠা উচিৎ।

রোমনাফ বেঞ্চে পা ছড়িয়ে বলে—এমন কিছু দেরী হয়নি,

হেলেন! কে জানে, জীবনের এই মুহূর্ত স্বপ্ন নাকি সত্য; যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে স্বপ্নের চেয়েও মধুর, আর স্বপ্ন হলে, সত্যের চেয়েও উজ্জ্বল।

হেলেন অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ায়, রোমনাফের হাত ধরে বলে—আমার মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মাথা ঘুরছে। চলো, আমার বাড়ীতে পেঁাছে দাও।

রোমনাফ তার হাত ধরে নিজের পাশটিতে বসিয়ে বলে—কিন্তু ···আমি সে এগারোটায় গাড়ী আনতে বলেছি।

হেলেন মুখ থেকে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসে—এগারোটা!

'হ্যাঁ, এখন এগারোটা বাজতে দাও। এসো, ততক্ষণ কিছু কথাবার্তা হোক্। রাত আমার কাছে কালো সমুদ্র মনে হয়। যতটা ওকে দূরে রাখতে পারি, ততই ভালো। আমি মনে করি, সেদিন তুমি সৌভাগ্যের দেবী হয়ে এসেছিলে হেলেন, নইলে এতদিনে না-জানি আরও কত অত্যাচার আমি করে বসতাম। এই উদারনীতি সমগ্র পরিবেশে যে শুভ পরিবর্তন এনেছে, তা ভেবে আমি নিজেই বিস্মিত বোধ করি। মাসাবধি দমন-পীড়নে যা করা সম্ভব হয়নি, সেদিনের আশ্বাস তা সম্পূর্ণ করে দেখিয়েছে। এবং এজন্য আমি তোমার প্রতি ঋণী হেলেন, কেবল তোমার প্রতি। কিন্তু দুঃখ এই যে, আমাদের সরকার দয়া করতে জানে না, শুধু মারতে জানে। জারের মন্ত্রীমণ্ডলে এখন থেকে আমার সম্পর্কে সন্দেহ করতে শুরু করেছে, এবং আমাকে এখান থেকে দূরে সরিয়ে ফেলার প্রস্তাব নিয়েছে।

সহসা টর্চের ঝলসানো আলো বিদ্যুতের মত চমকে ওঠে, এবং রিভলবারের গুলীর আওয়াজ শোনা যায়। সেই মুহূর্তে রোমনাফ লাফিয়ে গিয়ে আইভানকে ধরে ফেলে, তারপর চেঁচিয়ে ওঠে—ধরো-ধরো! খুন! হেলেন, তুমি এখান থেকে পালাও।

পার্কে কয়েকজন সান্ত্রী প্রহরায় ছিল। চারদিক থেকে তারা

দৌড়ে আসে। আইভানকে ঘিরে ধরে। মুহূর্তে আশপাশ থেকে টাউন-পুলিশ, সশস্ত্র পুলিশ, গুপ্ত পুলিশ এবং ঘোড়সওয়ার পুলিশের দল এসে হাজির হয়। আইভান গ্রেপ্তার হয়।

রোমনাফ হেলেনের হাত ধরে সন্দিগ্ধ স্বরে বলে—আইভান! তোমার সঙ্গে সে বিদ্যালয়ে পড়ত না?

হেলেন ক্ষুব্ধ হয়ে বলে—হ্যাঁ, কিন্তু আমার বিন্দুমাত্র অনুমাণ ছিল না যে, সে বিপ্লবী হয়ে পড়েছে।

'গুলিটা ঠিক আমার মাথার পাশ দিয়ে সন্ সন্ করে বেরিয়ে গেছে।

ঈশ্বর।

'দ্বিতীয় বার ফায়ার করার সুযোগ দিই নি। এই যুবকের পরিণতি ভেবে আমার খুব দুঃখ হচ্ছে, হেলেন। হতভাগা ভাবছে এইভাবে হত্যা করে দেশ উদ্ধার করবে। আমি যদি মারা পড়তাম, আমার জায়গায় কি আরও কঠোর, নির্মম মানুষ এসে হাজির হতো না? কিন্তু আমার একটুও ক্রোধ, দুঃখ বা ভয় নেই হেলেন, তুমি কিছু ভেবো না। চলো, আমি তোমায় পেঁাছে দিই।

সারা রাস্তায় রোমনাফ এই আঘাত থেকে রক্ষা পাবার ফলে নিজের সৌভাগ্য, এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে থাকে। হেলেন চিন্তা-ভাবনায় ডুবে থাকে।

পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযোগ শুরু হয়, হেলেন সরকারী সাক্ষী। আইভান বুঝতে পারে তার পৃথিবী অন্ধকার হয়ে পড়েছে, এবং সে অতল গভীরে ডুবে চলেছে।

॥ ৩

চৌদ্দ বছর পর।

আইভান রেলগাড়ী থেকে নেবে হেলেনের কাছে চলেছে। বাড়ীর লোকেদের সম্পর্কে তার কোন হুঁশ নেই। মা-বাবা তার

মরণাপন্ন, অথচ তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। চৌদ্দ বছর ধরে লালিত হিংসায় উন্মত্ত সে হেলেনের কাছে চলেছে ; কিন্তু তার হিংসায় রক্তের পিপাসা নেই, বরং এক গভীর দাহ্য দুর্ভাবনা আছে। এই চৌদ্দ বছরে সে যতখানি যন্ত্রণা ভোগ করেছে, তা দু-চার কথায় বলে বিষের মত হেলেনের ধমনীময়ে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে অনুতপ্ত দেখে সে নিজের চোখ তৃপ্ত করতে চায়। কি সেসব কথা ?—'হেলেন, তুমি আমার সঙ্গে যে বিট্রে করেছ, তা সম্ভবতঃ স্ত্রী-চরিত্রের ইতিহাসে অদ্বিতীয়। আমার সর্বস্ব তোমার চরণে অর্পণ করেছি। কেবল তোমার কথার মুখাপেক্ষী ছিলাম। তুমিই রোমনাফকে হত্যা করার জন্য আমায় পাঠিয়েছিলে, অথচ তুমিই আমার রিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছো ; স্রেফ নিজের আবিল কাম-লিপ্সা পূর্ণ করার জন্য। আমার বিরুদ্ধে অন্য কোন প্রমাণ ছিল না। রোমনাফ এবং তার সমগ্র পুলিশ-বাহিনী মিথ্যে সাক্ষী দিয়েও আমায় পরাস্ত করতে পারত না ; কিন্তু তুমি—তুমি কেবল নিজের বাসনা তৃপ্ত করার জন্য, রোমনাফের বিষাক্ত আলিঙ্গনে আনন্দ পাবার জন্য আমার সঙ্গে এই বিশ্বাসঘাতকতা করেছো। কিন্তু, চোখ খুলে দেখো—সেই আইভান, যাকে তুমি পায়ের তলায় মাড়িয়ে ছিলে, আজ তোমার সেইসব ভণ্ডামির আবরণ ছিঁড়ে ফেলার জন্য তোমার সামনে দাঁড়িয়ে। তুমি রাষ্ট্রের সেবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলে। তুমি নিজেকে রাষ্ট্রের বেদীতে হোমাগ্নি দিতে চেয়েছিলে ; কিন্তু কুৎসিত কামনার প্রথম প্রলোভনে তুমি তোমার বহুরূপ জলাঞ্জলি দিয়ে ভোগ-লালসার দাসত্ব করতে নেমে পড়েছো। অধিকার এবং সমৃদ্ধির প্রথম টুকরোর দিকে লেজ নাচাতে-নাচাতে তুমি লাফিয়ে পড়েছো। ছিঃ। ছিঃ। ধিক্কার জানাই তোমার ভোগ-লিপ্সা, তোমার এই কুৎসিত জীবন।'

॥ ৪ ॥

সন্ধ্যাবেলা। পশ্চিম দিগন্তে দিবস-চিতা পুড়ে শীতল হয়ে এসেছে, ওদিকে রোমনাফের বিশাল ভবনে হেলেনের মৃতদেহ কফিনে বয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছিল। শহরে গণ্যমান্যরা উপস্থিত। রোমনাফ তার শোক-কম্পিত হাতে মৃতদেহ পুষ্পস্তবকে সাজায়, এবং আত্মজলে তাকে শীতল করে। ঠিক সেই সময়ে আইভান, উন্মত্ত-ভাবে, দুর্বল, ঝুঁকে পড়া, মাথায় দীর্ঘ আলুথালু কেশ, কংকালের প্রতিমূর্তি এসে দাঁড়ায়। কেউ তার দিকে মনোযোগ দেয় না। ভেবেছে, হয়তো কোন ভিখিরী—এমন অবসরে কিছু দানের লোভে এসে হাজির হয়েছে।

শহরের বিশপ শেষ-সংস্কার সমাপ্ত করেন, তারপর মরিয়মের শিষ্যরা নতুন জীবনের প্রার্থনা সঙ্গীত গেয়ে শেষ করে উঠেছে, আইভান তখন মৃতদেহের কাছে গিয়ে আবেগে কাঁপতে-কাঁপতে বলে—এই সেই ভ্রষ্টা রমণী, পৃথিবীর সমস্ত পবিত্র আত্মার শুভেচ্ছাও তাকে নরকের যন্ত্রণা থেকে রেহাই দেবে না। সে এমন কাজের যোগ্য যে এর মৃতদেহ···

কয়েকজন দৌড়ে এসে তাকে ধরে ফেলে, এবং ধাক্কা দিতে-দিতে ফটকের দিকে নিয়ে যায়। সেই সময় রোমনাফ এসে তার কাধে হাত রাখে, এক পাশে নিয়ে গিয়ে বলে—বন্ধু, তোমার নাম কি ক্লডিয়াস আইভনাফ? হ্যাঁ, তুমি সেই, তোমার চেহারা আমার মনে পড়েছে। আমি সব কিছু জানি, খুঁটিনাটি সব কিছু। হেলেন আমার কাছে কোন কথা লুকোয়নি। এখন সে আর এই পৃথিবীতে নেই, মিথ্যে কথা বলে তার আর কোন সেবা করতে পারবো না। তুমি তার প্রতি কঠোর শব্দ ব্যবহার করো, বা কঠোর আঘাত করো না কেন, সে সমানভাবেই শান্ত থাকবে, কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত

তোমার কথা বলেছে। সেই প্রসঙ্গের স্মৃতি তাকে সর্বদা কাতর রেখেছে। তার জীবনে বড় কামনা ছিল, নতজানু হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। মৃত্যুর পূর্বে সে উইল করে গেছে, যেভাবেই হোক, তার সেই অভিলাষ তোমার কাছে যেন পৌছে দেয়া হয়—সে অপরাধিনী এবং তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। তুমি কি মনে করো, যদি সে তোমার সামনে অশ্রুসিক্ত চোখে এসে দাঁড়াতো, তোমার হৃদয় পাথর হলেও কি গলে পড়ত না? এই সময়েও কি সে তোমার কাছে দীন-প্রার্থী প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে নেই? এসো, তার সহাস্য মুখ দেখো। মঁশিয় আইভান তোমার হৃদয় এখনও তাকে চুম্বন করতে উদগ্রীব হয়ে উঠবে। আমার একটুও ঈর্ষা হবে না। পুষ্পশয্যায় শুয়ে তাকে এমন মনে হচ্ছে, যেন সত্যি সে ফুলদের রাণী। জীবনে তার একটিই অভিলাষ অসম্পূর্ণ থেকে গেল, তা হলো তোমার ক্ষমা। প্রেমিক-হৃদয় উদার হয়ে থাকে আইভান, ক্ষমা এবং দয়ার সাগর। ঈর্ষা এবং দম্ভের নোংরা নালা তাতে মিশে, ঠিক ততখানি বিশাল ও পবিত্র হয়ে ওঠে। যাকে একবার তুমি প্রেম করেছো, তার শেষ অভিলাষ তুমি উপেক্ষা করতে পারো না।

সে আইভানের হাত ধরে, অসংখ্য কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টির সামনে তাকে নিয়ে আসে; তারপর কফিনের ওপরের আচ্ছাদন সরিয়ে দিয়ে হেলেনের শান্ত মুখশ্রী দেখায়। ঐ নিস্পন্দ, নির্লিপ্ত, নির্বিকার ছবিকে মৃত্যু এক গরিমা দিয়েছে, স্বর্গের যাবতীয় বিভূতি যেন তাকে সুস্বাগত জানাচ্ছে। আইভানের কুটিল চোখে সহসা এক দিব্য জ্যোতি ঝল্‌সে ওঠে, এবং সেই দৃশ্য সামনে ফুটে ওঠে—যখন সে হেলেনকে প্রেমে আলিঙ্গন করেছিল, তার হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ ও উল্লাস পুষ্প মাঝে গেঁথে তার গলায় দিয়ে বরণ করেছিল। তার মনে হল, যা কিছু তার সামনে ঘটছে-সবই-স্বপ্ন; এবং সহসা তার চোখ খুলে যায়, টের পায় সে ঐভাবে হেলেনকে বক্ষমাঝে জড়িয়ে আছে। সেই আনন্দের একটি মুহূর্তের জন্য সে কি আবার চৌদ্দ বছর

কারাবাসের জন্য প্রস্তুত হবে না! আজও তার জীবনে সেই সুখময় দিনগুলি ছিল—যা হেলেনের সঙ্গে যাপন করেছিল—এবং সেই দিনগুলির অনুপম আনন্দ এই চৌদ্দ বছরেও কি ভোলা যায়? সে কফিনের ধারে বসে শ্রদ্ধায় কম্পিত স্বরে প্রার্থনা করে—'ঈশ্বর, আমার প্রাণাধিক প্রিয় হেলেনকে ক্ষমার আঁচলে তুলে নাও।' যখন কফিন কাঁধে তুলে নিয়ে যেতে শুরু করে, তখন তার আত্মা লজ্জিত! নিজের সংকীর্ণতায়, নিজের উদ্বিগ্নতায় নিজের নীচতায়। কফিন কবরে রাখার পর, সেখানে বসে বহুক্ষণ কাঁদতে থাকে।

পরদিন রোমনাফ যখন ফাতেহা পড়তে আসে, দেখতে পায়, আইভান কবরের বেদীর ওপর মাথা নত করে আছে; তার আত্মা স্বর্গের দিকে প্রয়াণ করেছে।

## নেশা

ঈশ্বরী এক বড় জমিদারের ছেলে, আর আমি হলাম এক গরীব ক্লার্কের—আমার কাছে পরিশ্রম ও মজুরী ছাড়া অন্য কোন সম্পত্তি নেই। আমাদের তুজনের মধ্যে প্রায় তর্ক-বিতর্ক হতো। আমি জমিদারদের নিন্দা করতাম, তাদের হিংস্র পশু, রক্তচোষা জোঁক এবং গাছের মাথায় বসা শকুন বলতাম। সে জমিদারদের পক্ষ নিত, কিন্তু স্বভাবতঃ তার যুক্তি কিছু তুর্বল, কেননা তার কাছে জমিদারদের আনুকুল্যে কোন দলিল নেই। সব মানুষ সমান হয় না, সর্বদা ছোট-বড় হয়ে থাকে, এবং হবে—নিতান্ত সাধারণ দলিল। কোন মানবিক বা নৈতিক নিয়মে এই অবস্থার ঔচিত্য প্রমাণ করা কঠিন। এই তর্ক-বিতর্কের উষ্ণ আবহাওয়ায় আমি মাঝে-মাঝে উত্তেজিত হয়ে পড়তাম, এবং আঘাতজনিত কথা বলে ফেলতাম; কিন্তু ঈশ্বরী হেরে গিয়েও হাসতে থাকত। আমি কখনও তাকে উত্তেজিত হতে

দেখিনি। হয়তো সে নিজের পক্ষের দুর্বলতা বুঝতো। চাকরদের সঙ্গে সে কখনও ভাল করে কথা বলত না। ধনীদের মাঝে যে এক ধরণের নির্মমতা ও অহঙ্কার থাকে, ঈশ্বরীর মাঝেও তা প্রচুর পরিমাণে ছিল। চাকর যদি কখনও বিছানা পাততে সামান্য দেরী করত, প্রয়োজনের চেয়ে দুধ বেশী গরম বা ঠাণ্ডা হত, কিংবা সাইকেল ভাল করে ধোয়ামোছা না হতো—তাহলে সে নিজের ভেতর থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসত। আলস্য এবং অভদ্রতা সে এতটুকু বরদাস্ত করতে পারত না। কিন্তু বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে—বিশেষ করে আমার সঙ্গে—তার ব্যবহার সৌহার্দ্যপূর্ণ ও নম্র ছিল। যদি তার জায়গায় আমি হতাম, তাহলে আমার মাঝেও সেই কঠোরতা সৃষ্টি হত—যা তার মাঝে আছে; কেন না আমার লোক-প্রেম কোন সিদ্ধান্তে নয় বরং আমার নিজস্ব অবস্থায় টিঁকে আছে। কিন্তু, সে আমার জায়গায় থেকেও ধনী থাকত; কেন না সে ছিল প্রকৃতিগত বিলাসী ও ঐশ্বর্য প্রিয়।

এবার পূজোর সময় ঠিক করেছি, বাড়ী যাবো না। আমার কাছে ভাড়ার টাকা নেই, তাছাড়া বাড়ীর লোকদের অসুবিধায় ফেলতে চাই না। জানা ছিল, তাঁরা আমায় যা পাঠান, তা তাঁদের সামর্থ্যের বাইরে, তাছাড়া পরীক্ষার ব্যাপারেও চিন্তা আছে! এখনও বহু পড়া বাকী, বাড়ী গিয়ে কে আর পড়াশুনা করে! বোর্ডিং-এ ভূতের মত একা পড়ে থাকতেও মন চাইছে না। এমন সময় ঈশ্বরী যখন আমায় তার বাড়ী যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানায়, কোন ওজর-আপত্তি ছাড়াই আমি রাজী হয়ে পড়ি। ঈশ্বরীর সঙ্গে পরীক্ষার পড়াও তৈরী করা যাবে। সে ধনী হলেও বেশ পরিশ্রমী ও বিদ্যানুরাগী।

ঈশ্বরী এই সঙ্গে এও বলে রাখে—দ্যাখো ভাই, একটা ব্যাপার মনে রেখো। সেখানে যদি জমিদারদের নিন্দা করো, তাহলে অবস্থা সঙ্গীন হবে এবং আমার বাড়ীর লোকদের সেটা খারাপ লাগবে। আসামীদের তাঁরা এই দাবী নিয়ে শাসন করে যে ঈশ্বর তাঁদের সেবা

করতেই আসামীদের সৃষ্টি করেছে। আসামীরাও এটা মনে করে। যদি তাদের বুঝিয়ে দেয়া হয়, জমিদার ও আসামীদের মাঝে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই, তাহলে জমিদারদের অবস্থা কি দাঁড়াবে, বল।

আমি বলি—তুমি কি মনে করো আমি সেখানে গিয়ে অন্য ধরণের হয়ে যাবো ?

'হ্যাঁ, আমার তাই বিশ্বাস।'

'তুমি কিন্তু ভুল ভাবছো।'

ঈশ্বরী এর কোন উত্তর দেয় না। এই বিষয়টা সে আমার বিবেকের ওপর ছেড়ে দেয়। যদি সে নিজের ধারণা আকড়ে ধরে থাকতো, তাহলে আমিও জেদ ধরে থাকতাম।

॥ ২ ॥

সেকেণ্ড ক্লাশ দূরের কথা, আমি কখনও ইণ্টার ক্লাশে চেপে ভ্রমণ করিনি। এবার সেকেণ্ড ক্লাশে ভ্রমণের সৌভাগ্য ঘটে। গাড়ী আসার সময় রাত ন'টা ; কিন্তু যাওয়ার আনন্দে আমরা সন্ধ্যে নাগাদ ষ্টেশনে গিয়ে হাজির হয়ে পড়ি। কিছুক্ষণ ইতঃস্তত ঘুরে বেড়াবার পর রিফ্রেশমেণ্ট রুমে খাবার খেতে যাই। আমার বেশ-ভূষা এবং চাল-চলন দেখে অভিজ্ঞ খানসামাদের বুঝতে দেরী হয় না মনিব কোনজন আর কেই বা কে : কেন জানি, তাদের গোস্তাকী আমার খারাপ লাগতে থাকে। পয়সা ঈশ্বরীর পকেট থেকে বেরোয়। সম্ভবতঃ আমার বাবা যে মাইনে পান, তার চেয়ে বেশী এইসব খানসামাদের ইনাম-বখশিশে প্রাপ্ত হয়। যাবার সময় ঈশ্বরী একটা আধুলি দেয়। তবুও আমি ওদের কাছ থেকে সেই রকম তৎপরতা ও বিনয়ের প্রতীক্ষা করি—যেমনটি তারা ঈশ্বরীর সেবা করে। ঈশ্বরীর হুকুমে সকলে দৌড়ে আসে ; অথচ আমি একটা কিছু চাইলে

তেমন উৎসাহ দেখায় না। খাবারে তেমন কোন স্বাদ পাই না। এই পার্থক্য আমার মন একেবারে নিজেকে ধরে রাখে।

গাড়ী আসে, আমরা দুজনে উঠে পড়ি। খানসামা ঈশ্বরীকে সেলাম জানায়। আমার দিকে ফিরেও তাকায় না এতটুকু।

ঈশ্বরী বলে - দেখেছো, এরা সকলে কেমন কায়দা-দুরস্ত! অথচ আমাদের চাকরগুলোকে দেখো—কাজ করার কোন কায়দা নেই।

আমি নিরুৎসাহ গলায় বলি—তোমার চাকরদের তুমি যদি রোজ এই রকম আট-আনা- বখশিশ দাও; তাহলে হয়তো এর চেয়ে বেশী ভদ্র-সেবাপরায়ণ হয়ে উঠবে।

'তুমি কি মনে করো, এরা শুধু বখশিশের লোভে এত আদব-কায়দা করে?'

'আজ্ঞে না, কখনই না! ভদ্রতা ও আদব-কায়দা এদের রক্তে যে মিশ্রিত আছে।'

গাড়ী রওনা হয়। ডাকগাড়ী। প্রয়াগ থেকে রওনা হবার পর প্রতাপগড়ে এসে থামে। একজন লোক আমাদের কম্পার্টমেণ্ট খোলে। আমি সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠি—সেকেণ্ড ক্লাস! সেকেণ্ড ক্লাস!

সেই যাত্রী কামরার ভেতর ঢুকে আমার দিকে এক বিচিত্র দৃষ্টিতে দেখে বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ, অধম এটা ভাল করেই জানে, বলেই মাঝখানের বার্থে গিয়ে বসে পড়ে। আমার এমন লজ্জা হয় যে কি বলবো।

ভোর হতে হতে আমরা মোরাদাবাদে গিয়ে পৌঁছাই। ষ্টেশনে কয়েকজন লোক আমাদের স্বাগত জানাবার জন্য দাঁড়িয়েছিল। দুজন ভদ্রলোক। পাঁচজন চাকর। চাকরেরা এগিয়ে এসে আমাদের লাগেজ তোলে। ভদ্রলোক দুজন আমাদের পেছনে পেছনে আসে। তাদের একজন মুসলমান—রিয়াসত আলী; অন্যজন ব্রাহ্মণ—রামহরখ। দুজনেই আমার দিকে অপরিচিত চোখে দেখে, যেন বলে, তুমি কে হে হাঁসের সঙ্গে কাক?

রিয়াসাত আলী ঈশ্বরীকে জিজ্ঞেস করে—বাবুসাহেব কি আপনার সঙ্গে পড়াশুনা করেন ?

ঈশ্বরী জবাব দেয়—হ্যাঁ, এক সঙ্গে পড়াশুনা করেন, এক সঙ্গে থাকেন ও। বলতে পারেন, এর দৌলতেই আমি এলাহাবাদে পড়ে আছি, নইলে কবে লক্ষ্ণৌ চলে যেতাম। এবার এঁকে ধরে এনেছি। বাড়ী থেকে কতগুলো টেলিগ্রাম এসেছে; কিন্তু আমি সবকটার রাজী না হওয়ার জবাব পাঠিয়ে দিয়েছি। শেষ টেলিগ্রামটি দিল আর্জেন্ট—যার প্রতি শব্দের ফি চার আনা—সেটার জবাবেও 'রাজী না হওয়া' পাঠিয়ে দিয়েছি।

ওরা দুজনে আমার দিকে চকিত দৃষ্টিতে দেখে।

রিয়াসত আলী কিছুটা শঙ্কিত স্বরে বলে—কিন্তু ইনি বড় সাধারণ বেশভূষায় থাকেন।

ঈশ্বরী তার শঙ্কা সঙ্গে সঙ্গে নিবারণ করে—মহাত্মাগান্ধীর শিষ্য বুঝলেন! খাদি ছাড়া অন্য কোন কিছুই পরেন না। পুরনো সমস্ত পোষাক-আশাক পুড়িয়ে ফেলেছেন! বলতে পারেন রাজা মানুষ। আড়াই-লাখ সন্ত্রাসের জমিদারী; কিন্তু এঁর চেহারা দেখুন, মনে হবে এইমাত্র অনাথালয় থেকে ধরে আনা হয়েছে।

রামহরখ বলে—বড়লোকের মধ্যে এমন স্বভাব খুব কম দেখা যায়। কেউ এতটুকু অনুমান করতে পারবে না।

রিয়াসত আলী সমর্থন জানায়—আপনি যদি মহারাজা চাণ্ডলীকে দেখতেন, তাহলে অবাক হতেন। একটা মোটা কাপড়ের মেরজাই আর কাঁচা চামড়ার জুতো পরে বাজারে ঘুরে বেড়াতেন। শুনেছি, একবার নাকি বেগার খাটাবার জন্য ধরে নিয়ে যায়, উনিই কিনা দশ লাখ টাকা দিয়ে কলেজ খুলে দেন।

আমি মনে-মনেই মাটিতে মিশে যাচ্ছি; কিন্তু জানি না কি কারণে এই সরাসরি মিথ্যে সে সময়ে আমার কাছে হাস্যাস্পদ মনে

হয় না। তার প্রতিটি কথার সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন ঐ কল্পিত বৈভবের সমীপে এসে পড়তে থাকি।

আমি ঘোড়সওয়ার নই। সেই ছেলেবেলায় কয়েকবার টাট্টু ঘোড়ায় চড়েছি। বেরিয়ে দেখি, দুটো দীর্ঘ ঘোড়া আমাদের জন্য তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে আমার প্রাণ শুকিয়ে যায়। চেপে বসি: এদিকে হৃদ্‌পিণ্ড কাঁপতে থাকে। অথচ চোখে-মুখে সামান্যতম ভ্রূকুটি ফুটতে দিই না। ঘোড়াটাকে ঈশ্বরীর পেছনে এগিয়ে দিই। ভাগ্য ভালো যে ঈশ্বরী ঘোড়াটাকে জোরে হাঁকালো না, নইলে হয়তো আমি হাত-পা ভেঙ্গে ফিরে আসতাম। ঈশ্বরী হয়তো বুঝতে পেরেছে, কতখানি জলে আমি পড়ে আছি।

॥ ৩ ॥

ঈশ্বরীর বাড়ী তো নয়, একটা দূর্গ বলা চলে। ইমামবাড়ার মত ফটক, দরজায় টহলরত প্রহরী, চাকর-বাকরদের কোন হিসেব নেই, দোরে একটা হাতি বাঁধা। ঈশ্বরী তার বাবা, কাকা, জ্যেঠা সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়, তেমনই অতিশয়োক্তি সহ। এমনভাবে আকাশে তুলে ধরে যে কহতব্য নয়। চাকর-রাকররাই শুধু নয়, বাড়ীর প্রতিটি লোকেরা আমায় সমীহ করতে থাকে। গাঁয়ের জমিদার, লাখ টাকার আমদানী, অথচ পুলিশ-কনষ্টেবলকেও অফিসার মনে করে। কয়েকজন লোক আমায় হুজুর · হুজুর ডাকতে শুরু করে।

যখন একটু ফাঁকা হয়, আমি ঈশ্বরীকে বলি—তুমি তো আচ্ছা শয়তান হে, আমায় এমন নাজেহাল করছো কেন?

ঈশ্বরী দৃঢ় হাসি হেসে বলে—এই সব গাধাদের সামনে এই চালাকীর দরকার ছিল, নইলে সাদা মুখে কথাও বলতো না।

একটুক্ষণ পরে নাপিত আসে আমাদের পা টিপতে। কুমার বাহাদুররা ষ্টেশন থেকে এসেছেন, ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ঈশ্বরী আমার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন—আগে কুমারবাহাদুরের পা টেপ।

আমি খাটের ওপর শুয়েছিলাম। আমার জীবনে এমন সৌভাগ্য কখনও ঘটেনি যে কেউ আমার পা টিপে দিয়েছে। এইসব ব্যাপারগুলি ধনীদের বিলাসীতা, জমিদারদের গাধামী এবং বড়লোকদের খেয়াল আরও কত কি বলে ঈশ্বরীকে পরিহাস করতাম। আজ আমিই কিনা সেইসব ব্যবহার করে রঈস হওয়ার অনুকরণ করছি!

এরি মধ্যে দশটা বেজে গেছে। প্রাচীন সংস্কারের লোক। নতুন আলো এখন সবে পাহাড়ের চূড়োয় এসে পড়েছে। ভেতর থেকে খাবারের ডাক আসে। আমরা স্নান করতে বেরিয়ে পড়ি। আমার ধুতি আমি সর্বদা নিজেই কেঁচে নিই; কিন্তু এখানে ঈশ্বরীর মত আমিও ধুতি ফেলে রেখে দিই। নিজের হাতে নিজের ধুতি কাঁচতে লজ্জা বোধ হয়। ভেতরে খেতে যাই। হস্টেলে জুতো পরে টেবিলে গিয়ে বসতাম। এখানে পা ধোয়াটা জরুরা। কাহার জল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঈশ্বরী পা এগিয়ে দেয়। কাহার ওর পা ধুইয়ে দেয়। আমিও পা এগিয়ে দিই। কাহার আমার পাও ধুইয়ে দেয়। আমার সেইসব সিদ্ধান্ত-ধারণা না জানি কোথায় উবে যায়।

॥ ২ ॥

ভেবেছিলাম, গাঁয়ে এসে একাগ্র মনে পডাশুনা করবো; কিন্তু, এখানে সারাটা দিন ঘুরে-বেরিয়ে কেটে যায়। কখনও নদীর ওপর বজরায় ভ্রমণ করি; কখনও মাছ বা পাখী ধরার শিকার করে বেড়াই; কখনও পালোয়ানদের কুস্তি দেখি, কখনও বা দাবা নিয়ে বসে পড়ি।

ঈশ্বরী প্রচুর ডিম আনায়, ঘরে স্টোভ ধরিয়ে 'ওমলেট' করা হয়। চাকরদের একটা দল সর্বদা আমাদের ঘিরে থাকে। আমাদের হাত-পা নাড়ানোর কোন দরকাব নেই। শুধু জিভ নড়ানোই যথেষ্ট। স্নান করতে বসলে লোকেরা স্নান করানোর জন্য হাজির, শুয়ে থাকলে তুজন লোক পাখা টানার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে।

মহাত্মাগান্ধীর শিষ্য কুমার বাহাত্বরের বেশ নাম ডাক, ভেতরে-বাইরে সর্বত্র আমার দাপট। প্রাতঃরাশে একটুও যেন দেরী না হয়, পাছে কুমারবাহাত্বর রাগ না করে বসেন ঃ বিছানা ঠিক সময়ে পাতা হয়, কুমারবাহাত্বরের নিদ্রার সময় উপস্থিত। আমি ঈশ্বরীর চেয়েও বেশী স্পর্শকাতর হয়ে পড়ি, অথবা হওয়ার জন্য বাধ্য হই। ঈশ্বরী নিজের হাতে বিছানা পেতে নেয়, কিন্তু কুমার যে অতিথি, নিজের হাতে কি করে সে বিছানা পাতে! তার মহানতায় যে দাগ ধরবে।

একদিন সত্যি-সত্যি এমন একটা ব্যাপার ঘটে। ঈশ্বরী বাড়ীতেই ছিল। হয়তো বাবা-মা'র সঙ্গে কথাবার্তায় দেরী করছে আসতে! এদিকে দশটা বেজে গেছে। ঘুম-ভারে আমার চোখ টেনে আসছিল ; কিন্তু বিছানা পাতি কি করে? কুমার বাহাত্বর হয়েছি যে। প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ কাহার আসে। বেশ খোসামুদে, মোসাহেবী ধরনের চাকর। বাড়ীর কাজকর্মে ব্যস্ত থাকায় আমার বিছানা পাতার কথা মনে ছিল না। এখন মনে পড়তেই, দৌড়ে ছুটে এসেছে। আমি ওকে এমন ধমক দিয়ে উঠি যে বেচারা মনে রাখবে বহুদিন।

ঈশ্বরী আমার ধমকানি শুনে বেরিয়ে আসে, বলে—খুব ভাল করেছো। এইসব হারামখোরেরা এমন ব্যবহারের যোগ্য।

এই রকম ঈশ্বরী একদিন একজায়গাও নিমন্ত্রণে গিয়েছিল। রাত হয়ে গেছে ; অথচ লম্ফ জ্বলেনি। টেবিলের ওপর লম্ফ রাখা ছিল। দেশলাই-ও সেখানেই ছিল ; কিন্তু ঈশ্বরী নিজে কখনও লম্ফ জ্বালাতো না। কুমার বাহাত্বরই বা জ্বালায় কি করে? আমি বিরক্ত

হয়ে উঠেছিলাম। খবরের কাগজ এসে রাখা আছে। মন সেদিকেই পড়ে আছে, অথচ লম্ফ নেই। দৈবযোগে সে-সময় মুন্সী রিয়াসত সেখানে আসে। আমি তার ওপর ফেটে পড়ি, এমন ধমকানি দিই যে বেচারা হতভম্ব হয়ে পড়ে—তোমাদের এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই যে লম্ফ জ্বালাতে হবে। বুঝি না, কি করে যে এমন কাম-চোর লোকেদের নিয়ে এখানে কাজ চলে। আমার ওখানে এক ঘণ্টাও চলতো না। রিয়াসত আলী কাঁপা-কাঁপা হাতে লম্ফ জ্বালিয়ে দেয়।

সেখানে একজন প্রামাণিক প্রায় আসতো। কিছুটা সাহসী ব্যক্তি, মহাত্মা গান্ধীর পরম ভক্ত। আমায় মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য মনে করে খুব সম্ভ্রম করতো; কিন্তু কিছু জিজ্ঞেসা করতে সংকোচ বোধ করত। একদিন আমায় একা পেয়ে কাছে এগিয়ে আসে, হাত জোড় করে বলে—হুজুর তো গান্ধীবাবার চেলা? লোকেরা বলাবলি করে এখানে স্বরাজ হলে আর জমিদার থাকবে না।

আমি দৃপ্তভাবে বলি—জমিদারদের থাকাটা দরকার কিসের? এরা গরীবদের রক্তচোষা ছাড়া আর কি বা করে?

প্রামাণিক আবার জিজ্ঞেস করে—তাহলে কি হুজুর, সব জমিদারদের জমি কেড়ে নেয়া হবে?

আমি বলি—অনেকে স্বেচ্ছায় দিয়ে দেবে। যারা স্বেচ্ছায় দেবে না তাদের জমি কেড়ে নিতেই হবে। আমরা তো তৈরী হয়ে বসে আছি যেই স্বরাজ হবে, আমার এলাকার সমস্ত চাষীদের নামে দানপত্র করে দেবো।

আমি চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসে ছিলাম। প্রামাণিক আমার পা টিপতে থাকে। আবার বলে—আজকাল জমিদারেরা বড্ড জুলুম করে, হুজুর! আমাকেও হুজুর আপনার এলাকায় সামান্য জমি দিন, গিয়ে সেখানে আপনার সেবা করে কাটাবো।

আমি বলি—এখন আমার কোন অধিকার নেই ভাই; কিন্তু যখন

অধিকার পাবো, আমি তোমাকেই সবচেয়ে আগে ডাকবো। তোমাকে মোটর ড্রাইভারি শিখিয়ে আমার ড্রাইভার করে নেবো।

শুনেছি, সেদিন সে প্রচুর সিদ্ধি খেয়ে বৌকে প্রচণ্ড মারধোর করেছিল, তারপর গাঁয়ের মহাজনের সঙ্গে ঝগড়া করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল।

॥ ৫ ॥

এভাবে ছুটি শেষ হয়, আমরা আবার প্রয়াগে রওনা হই। গাঁয়ের অনেকে আমাদের তুলে দিতে আসে। প্রামাণিক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশন পর্যন্ত আসে। আমিও নিজের অংশ খুব ভাল করে অভিনয় করি, এবং নিজের বিনয় ও দেবত্বের মোহর সকলের হৃদয়ে এঁকে দিই। ইচ্ছে করছিল প্রত্যেক চাকরকে বেশ ভালরকম বখশিস দিই, কিন্তু সেই সামর্থ্য কোথায়? রিটার্ন টিকিট কাটা ছিল, কেবল গাড়ীতে উঠে গিয়ে বসা; কিন্তু গাড়ী এলো একেবারে ভিড়ে ঠাসা। দূর্গাপূজোর ছুটি উপভোগ করে সকলেই ফিরে যাচ্ছে। সেকেণ্ড ক্লাসে তিল ধারনের জায়গা নেই। ইণ্টার ক্লাসের অবস্থা তার চেয়েও খারাপ! এটাই শেষ গাড়ী। এখানে আর থাকার উপায় ছিল না। কোন রকমে তৃতীয় শ্রেণীতে জায়গা পাই। আমাদের ঐশ্বর্য সেখানে মোহাবিষ্ট করে ফেলেছিল, তাই আমার বসতে খারপ লাগছিল। এসেছিলাম আরামে শুয়ে শুয়ে, যাচ্ছি প্রায় কুঁকড়ে। পাশ ফেরার জায়গাও ছিল না।

কয়েকজন লেখাপড়া জানা লোক ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে ইংরেজ রাজত্বের প্রশংসা করছিল। একজন বলে ওঠে—এমন ন্যায়নীতি অন্য কারো রাজত্বে দেখা যায়নি। ছোট-বড় সকলেই সমান। রাজা যদি কারো প্রতি অন্যায় করে, আদালত তার গলাও চেপে ধরে।

অন্যজন তাকে সমর্থন করে—আরে মশাই, আপনি নিজে বাদশা'র ওপর দাবী করতে পারেন। আদালতে বাদশা'র ডিক্রী হয়ে যায়।

একজন যাত্রী, যার পিঠের ওপর বেশ বড় সাইজের বোচকা বাঁধা, কলকাতায় যাচ্ছিল। কোথাও রাখার জায়গা পাচ্ছিল না। পিঠের ওপর বাঁধা। বেচারা অস্থির হয়ে বার বার দরজার কাছে দাঁড়ায়। আমি দরজার কাছেই বসে ছিলাম। বারবার আমার মুখের ওপর বোচকার ঘষাঘষি ভাল লাগছিল না! একেই হাওয়া-বাতাস কম, তদুপরি সেই গেঁয়ো লোকটা এসে আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে যেন আমার গলা টিপে ধরে। আমি কিছুক্ষণ দম বন্ধ অবস্থায় বসে থাকি। হটাৎ-ই আমার রাগ ধরে ওঠে। আমি ওকে ধরে পেছনে ঠেলে দিই, তারপর কষে দুটো চড় বসিয়ে দিই।

সে চোখ রাঙা করে বলে—মারছেন কেন বাবুজী, আমিও ভাড়া দিয়েছি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে আরও দু-তিনটে চড় কষিয়ে দিই।

কামরায় ঝড় ওঠে। চারদিক থেকে আমার ওপর কটু বর্ষণ শুরু হয়।

এতই যখন কোমল মন, উঁচু ক্লাসে গেলেই পারে?

বড় লোক নিজের বাড়ীতে। আমায় যদি এমন মারত, তাহলে দেখিয়ে দিতাম।'

কি অন্যায় করেছিল বেচারা। কামরায় নিঃশ্বাস নেওয়ার জায়গা নেই, জানালার ধারে একটু দম নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছে—তাতেই এত রাগ! বড় লোক হলে কি মানুষ নিজের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে ফেলে?

এটাও ইংরেজ রাজত্ব মশাই, এত যার প্রশংসা করছিলেন।

একজন গ্রাম্য লোক বলে—চাকরীতে এখনও ঢোকে নি, তাই মেজাজ কত!

ঈশ্বর ইংরেজীতে বলে—হোয়াট অ্যান ইডিয়ট য়ু আর!

এবং আমার নেশা এখন কিছুটা কমতে শুরু করেছে টের পাই।

# কর্ত্রী

শিবদাস ভাঁড়ারের চাবি তার পুত্রবধূ রামপ্যারীর কাছে ছুঁড়ে দেয়, তারপর প্রাচীন চোখে অশ্রুভরে বলে—বৌমা, আজ থেকে ঘর-সংসারের দেখাশোনার ভার তোমার ওপর। ঈশ্বর আমার সুখ দেখতে নারাজ, নইলে কেনই বা জোয়ান মদ্দ ছেলেকে ছিনিয়ে নেবে, বল! ওর বদলে কাজ করার একজন লোকের প্রয়োজন। একটা লাঙ্গল তুলে রাখলে চলবে না। আমারই কুকর্মে ঈশ্বরের এই অভিশাপ, আমি সব কিছু নিজের মাথায় তুলে নেবো। বিরজুর লাঙ্গল এখন থেকে আমিই সামলাবো। এদিকে বাড়ী-ঘরের দেখা-শোনা, কাজকর্ম—তুমি ছাড়া আর কে আছে? কেঁদো না মা, ঈশ্বরের যা ইচ্ছে, তাই ঘটেছে; তার যা ইচ্ছে হবে—তাই ঘটবে। তোমার-আমার কি কোন হাত আছে? আমি বেঁচে থাকতে তোমার দিকে কেউ চোখ তুলে চাইতে পারবে না। তুমি কোন চিন্তা করো না। বিরজু গেছে, আমি এখনও আছি।

রামপ্যারী ও রামদুলারী দুই সহাদরা বোন। দুজনের বিয়ে—মথুরা ও বিরজা—দুই সহোদর ভাইয়ের সঙ্গে হয়েছে। দুই বোন বাপের বাড়ীর মত শ্বশুর বাড়ীতেও সুখে-আনন্দে কাটাতে থাকে। শিবদাস পেনসন পায়। সারাদিন বাইরের ঘরে বসে গল্প-টল্প করে কাটান। ভরা সংসার দেখে সে খুশী, অধিকাংশ সময় সে ধর্মচর্চায় মেতে থাকে। দৈব যোগে বড় ছেলে বিরজু হঠাৎ জ্বরে পড়ে, এবং দিন পনরো হল সে মারা যায়। আজ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কর্ম সমাপন হয়, শিবদাস প্রকৃত কর্মবীরের মত জীবন সংগ্রামের জন্য শিরদাঁড়া সোজা করে। মনে তার যত দুঃখ হোক না কেন, কেউ কাঁদতে দেখে নি তাকে। আজ পুত্রবধূকে দেখে ক্ষণকাল তার চোখ সজল হয়ে ওঠে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনকে শক্ত করে, তারপর রুদ্ধ কণ্ঠে সান্ত্বনা

দেয় তাকে। মনে-মনে হয়তো যা ভেবেছিল, ঘরের কর্ত্রীত্ব দিলে বিধবার চোখের জল মুছে যাবে, আর যাই হোক, তাকে এত কঠিন পরিশ্রম করতে হবে না ; এইজন্য সে ভাঁড়ারের চাবি বৌমার সামনে ছুঁড়ে দেয়। বৈধব্যের ব্যথা কর্ত্রীত্বের গর্বে চাপা দিয়ে রাখতে চায়।

রামপ্যারী পুলকিত কণ্ঠে বলে—এ কি করে সম্ভব বাবা আপনি খাই-খাটুনি করবেন, আর আমি কিনা কর্ত্রী হয়ে বসে থাকবো ? কাজ-কর্মে মেতে থাকলে মন খারাপ হবে না, নইলে বসে-বসে কান্না ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না।

শিবদাস তাকে বোঝায়—বৌমা, দৈবগতি তো কারো হাতের নয়, কেঁদে-কেটে অশান্তি আনা ছাড়া আর কিই বা হবে ? ঘরে-সংসারেও অনেক কাজকর্ম থাকে। ধরো, সাধু সন্ন্যাসীরা এসে হাজির হল, কিংবা বাড়ীতে অতিথি এল—তাঁদের সেবা-সৎকারের জন্যও বাড়ীতে কাউকেই থাকতেই হবে।

বৌমা বহু যুক্তি দেখায়, কিন্তু শিবদাস মোটেই কথা শোনে না।

॥ ২ ॥

শিবদাস বাইরে বেরিয়ে যাবার পর রামপ্যারী চাবি তোলে, তার মনে অভূতপূর্ব গৌরব ও দায়িত্ববোধ অনুভূত হয়। কিছুক্ষণ সে স্বামী বিয়োগের দুঃখ ভুলে যায়। তার ছোট বোন ও দেওর দুজনেই কাজ করতে বেরিয়ে গেছে, শিবদাস বাইরে! বাড়ী একেবারে ফাঁকা। এই সময় নিশ্চিন্ত মনে সে ভাঁড়ার খুলতে পারে। তাতে কি কি জিনিষ আছে, কি কি বিভূতি—এটা দেখার জন্য তার মন আকুলি-বিকুলি করে ওঠে। এই ঘরে সে ইতিপূর্বে আসেনি। যখন কাউকে কিছু দেয়ার হতো, বা, কারো কাছ থেকে কিছু নেয়ার থাকতো—শিবদাস নিজে এসে এই ঘর খুলত। তারপর কাজ সারা

হলে বন্ধ করে চাবি কোমরে গুঁজে রাখত। রামপ্যারী মাঝে মাঝে দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি মারতো বটে, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা যেত না। গোটা বাড়ীতে ঐ ঘরটা ভৌতিক বা রহস্যময় ধরনের ছিল, যার সম্পর্কে নানান ধরনের কল্পনা জাগত। আজ সেই রহস্য উন্মোচন করে দেখার সুযোগ পেয়েছে রামপ্যারী। সে বাইরের দরজা বন্ধ করে দেয়,—পাছে কেউ না আবার তাকে ভাঁড়ার খুলতে দেখে ফেলে। হয়তো ভাববে, অদরকারে খুললো কেন? এসে কাঁপা-কাঁপা হাতে সে দরজা খোলে। বুক তার ধড়াস ধড়াস করতে থাকে, কেউ না আবার দরজায় নাড়া দেয়। ভেতরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভূত আনন্দ হয়—কিছুটা সেই রকম, বরং তার চেয়েও তীব্র যা গয়না কাপড়ের বাক্স খোলার সময় তার হতো। মটকায় গুড়, চিনি, গম, যব এসব রাখা রয়েছে। এক কোণে বাসন-কোসন রাখা—বিয়ে শাদীর সময় বার করা হতো কিংবা চাইলে কেউ দিতে হতো। কুলুঙ্গিতে খাজনার রসীদ ও লেন-দেনের কাগজ বাঁধা অবস্থায় আছে। ঘরে এক ধরণের বিভূতি ছেয়ে আছে। যেন, অজ্ঞাত রূপে লক্ষ্মী সেখানে বিরাজ করছে। সেই বিভূতির ছায়ায় রামপ্যারী আধ ঘণ্টা বসে নিজের আত্মা তৃপ্ত করতে থাকে। প্রতি মুহূর্তে তার হৃদয়ে মমত্ব নেশার মত ছেয়ে চলে। যখন সে ঐ ঘর থেকে বেরোয়, তার মনের সংস্কার আমূল বদলে যায়, কেউ যেন তাকে মন্ত্রপূত করে দিয়েছে।

সেই সময় হঠাৎ সদর দরজায় নাড়া দিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সে ভাঁড়ারের দরজা বন্ধ করে দেয়, তারপর গিয়ে সদর দরজা খুলে দেয়। দেখে, প্রতিবেশী স্ত্রী ঝুনিয়া দাঁড়িয়ে আছে। একটা টাকা ধার চায়।

রামপ্যারী রুক্ষ স্বরে বলে—এখন একটা পয়সাও ঘরে নেই দিদি, ক্রিয়াকর্মে সব খরচ হয়ে গেছে।

ঝুনিয়া ভ্যাবাচাকা খায়। চৌধুরীর ঘরে এ সময় একটা টাকাও

নেই—এটা বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। যেখানে হাজার টাকার লেন-দেন হয়, ক্রিয়াকর্মে সে সব কিছু খরচ করতে পারে না। . যদি শিবদাস কোন অজুহাত দেখাতো, ঝুনিয়া ততটা বিস্মিত হতো না। কিন্তু রামপ্যারী তার সরল স্বভাবের জন্য গাঁয়ে খ্যাত ছিল। প্রায় সে শিবদাসেব চোখ বাচিয়ে প্রতিবেশীদের প্রার্থিত জিনিষ দিত। এই তো, গতকালই সে জানকীকে সেরখানেক দুধ দিয়েছে। এমন কি গয়না চাইলেও সে দিয়ে দিত। কৃপণ শিবদাসের ঘরে এমন খরচে বৌয়ের আগমন গ্রামবাসীরা নিজেদের সৌভাগ্য বলে মনে করত।

ঝুনিয়া চকিত হয়ে বলে—এমন কথা বলো না গো দিদি, বড় অসুবিধেয় পড়ে এসেছি, নইলে তুমি তো জানো, আমার এমন স্বভাব নয়। আগেকার একটি টাকাও শোধ দিতে হবে। পেয়াদা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বক্‌বক্‌ করছে। টাকাটা দিলে কোন রকমে এই বিপদ থেকে রেহাই পাই। আটদিন পর আমি নিজে এসে টাকা দিয়ে যাবো। গাঁয়ে আর কোন ঘরই বা আছে, যেখানে চাইতে যাবো ?

কিন্তু প্যারী একটুও ঘাড় নাড়ায় না।

ঝুনিয়া চলে যেতেই প্যারী রাতের রান্নাবান্নার আয়োজন করতে থাকে। আগে, এই চাল-ডাল ঝাড়াই-বাছাই করাকে ঝঞ্ঝাট মনে হতো, রান্না ঘরে যাওয়া 'শূলে চড়ার চেয়ে' কম বোধ হত না। কিছুটা সময় তারা দুই বোনে ঠেলাঠেলি করত, তখন শিবদাস এসে বলতো—আজ কি রান্না চড়বে না। দুজনের একজনকে উঠে পড়তে হত। কোন রকমে মোটা-ভারি রুটি গড়ে রাখত, যেন বলদের খোরাক। আজ প্যারী মন-প্রাণে রান্নার আয়োজন করে। এখন সে বাড়ীর কর্ত্রী।

বাইরে বেরিয়ে দেখে, মেজেতে বড্ড ধুলো-ময়লা জমে আছে। এদিকে বুড়ো সারাদিন বসে মাছি তাড়ায়, ইচ্ছে করলে উঠে একটু ঝাঁট দিতেও পারে। এ টুকুও কি ওঁর দ্বারা হয় না ? দোরগোড়া

এমন ঝকঝকে তকতকে রাখা উচিৎ, চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মন যাতে খুশীতে ভরে ওঠে। এই নয় যে, বমি পেতে শুরু করবে। যদি এ কথাটা এখন বলি, অমনি চটে উঠবে। আচ্ছা, মুন্নী থেকে দূরে সরে আছে কেন?

সে মুন্নীর কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে। দুর্গন্ধ আসছে। ঠিক। দেখে মনে হয়, মাসাবধি জল পাল্টানো হয় নি। গরুটার অবস্থাও সেই রকম। নিজের পেট ভরল, কাজ শেষ, আর কার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক? দুধ সকলেরই ভালো লাগে। শ্বশুরমশাই দোরে বসে হুকো টানছে, অথচ একটুও কি সময় পায় না, উঠে গিয়ে চার ঘড়া জল নাদে ঢেলে দেয়। জন-মজুর রাখা হয়েছে, তাও কানা-কড়ির। খাওয়ার বেলায় দেড়া; অথচ কাজের নামে মাথায় যেন বাজ পড়ে। আসুক আজ, এলেই জিজ্ঞেস করবো— নাদে জল পাল্টাস্‌নি কেন? থাকতে হলে থাক, নইলে সরে যাক। লোক অনেক পাওয়া যাবে! কাজের জন্য জনেরা চারদিকে হন্যে হয়ে ফেরে।

সে আর থাকতে পারে না। ঘড়া তুলে জল আনতে যায়।

শিবদাস ডাকে—জল কিসে লাগবে বৌমা? এতে জল ভরা আছে।

প্যারী বলে—নাদে জল পচে গেছে। মুন্নী জারে আর মুখ দিচ্ছে না। দেখছেন, কত দূরে সরে আছে।

শিবদাস মর্মস্পর্শী হাসে, উঠে এসে বৌমার হাত থেকে ঘড়া নিয়ে জল আনতে যায়।

॥ ৩ ॥

কয়েকমাস কাটে। প্যারীর অধিকারে আসার পর সেই বাড়ীতে যেন বসত নেমে এসেছে। ভেতর-বাইরে যেখানেই চোখ ফেরাই

না কেন, সর্বত্র এক নিপুণ ব্যবস্থাকারীর হস্ত-কৌশল, সুবিচার ও সুরুচির ছাপ প্রস্ফুটিত। প্যারী গৃহযন্ত্রে এমন চাবি দিয়েছে যার ফলে যাবতীয় কলকব্জা ঠিকমত চলতে শুরু করেছে। আগের চেয়ে ভাল খাবার পাওয়া যায়, এবং সময়-মতো পাওয়া যায়। দুধ বেশি হয়, ঘি বেশি হয় এবং কাজও বেশি হয়। প্যারী নিজে বিশ্রাম করে না, অন্যদেরও বিশ্রাম করতে দেয় না। বাড়ীতে এমন ব্যবস্থা যে জিনিষ চাইবে, তা বাড়ীতেই পাওয়া যায়। মানুষ, জন্তু সকলেরই স্বাস্থ্য ভাল। এখন আর আগের মত দশা নেই, ছেঁড়া কানি পরে কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে, গয়নার জন্য কেউ বা বায়না করছে। তবে, হ্যাঁ, কেউ যদি রুগ্ন, চিন্তিত এবং মলিন বেশে থাকে—সে হলো প্যারী; তবুও গোটা বাড়ী তার বিপক্ষে ফুঁসতে থাকে। এমন কি বুড়ো শিবদাসও মাঝে মাঝে তার নিন্দা করে। প্রহর রাত থাকতে কার বা উঠতে ভাল লাগে? খাটুনি থেকে সকলেই দূরে সরে থাকতে চায়। তবুও, একথা সকলেই স্বীকার করে—প্যারি না হলে ঘরের কাজ চলবে না। অন্যদের কথা বাদ দাও, দুই বোনের মধ্যে এখন তেমন আপন-ভাব নেই।

ভোর বেলা। দুলারী হাতের বালা এনে প্যারীর সামনে আছড়ে ফেলে বকবক করে ওঠে—এটা তুলে নিয়ে ভাঁড়ার ঘরে বন্ধ করে রাখো।

প্যারী বালা তুলে নেয়, তারপর কোমল স্বরে বলে—বলেছি তো, হাতে টাকা আসলে গড়িয়ে দেবো। এমন কিছু ক্ষয়ে যায়নি যে আজই খুলে রাখতে হবে।

দুলারী ঝগড়া করার জন্য তৈরী হয়ে এসেছিল। বলে ওঠে—তোমার হাতে টাকা আসবে কেন, আর কেনই বা বালা গড়তে দেবে? জোড়ায় জোড়ায় রাখতে খুব ভাল লাগে, তাই না?

প্যারী হেসে বলে—জোড়ায় জোড়ায় রাখি, তা শুধু তোর জন্যই। আমার জন্য কি কেউ বসে আছে, নাকি আমি সবচেয়ে

বেশী খাই-পরি। কবে থেকে আমার অনন্ত ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে।

ত্বলারী—তুমি খাও না-খাও, পরো না-পরো, তাতে কি, প্রশংসা পাচ্ছো তো! এখামে খাওয়া-পরা ছাড়া আছেই বা কি? আমি তোমার হিসেব-টিসেব বুঝি না, আজকেই আমার বালা গড়তে দাও।

প্যারী সরল ভাবে জিজ্ঞেস করে—টাকা না থাকলে কোথেকে গড়তে দেবো?

ত্বলারী কিছুটা রুক্ষ ভাবে বলে—এসব আমি জানি না। আমার বালা চাই-ই।

এইভাবে বাড়ীর লোকেরা সুযোগ মত প্যারীকে ত্ব-চার কটু কথা শুনিয়ে দেয়, আর সে বেচারী হেঁসে সকলের মেজাজ সহ্য করে। কর্ত্রীর ধর্মই এই, সে সকলের মেজাজ সহ্য করে সেই কাজ করে যাতে পরিবারের কল্যাণ হয়। কর্ত্রীত্বের কবজে মেজাজ, ব্যঙ্গোক্তি, ভৎসনা—কোন কিছুর প্রভাব পড়ে না। তার কর্ত্রীত্বের কল্পনা এইসব আঘাতে আরও সুস্থ হয়ে ওঠে। সে সংসারের পরিচালিকা! সকলেই নিজের নিজের ত্বঃখ তার কাছে গায়; কিন্তু সে যা করে, সেটাই ঘটে। তাকে খুশী করার জন্য সেটাই যথেষ্ট।

গাঁয়ে প্যারীর প্রশংসা হয়। কিই বা বয়স, অথচ গোটা সংসার সামাল দিয়ে আছে। চাইলে, আবার বিয়ে করে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে। তা না করে, এই সংসারের পেছনে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছে। কখনও কারো সঙ্গে হাসে টাসে না, কথা বলে না। যেন একেবারে বদলে গেছে।

দিন কয়েক পরে ত্বলারীর বালা গড়িয়ে আসে। প্যারী নিজেই সাঁকরার বাড়ী ছুটে যায়।

সাঁঝ নেমে এসেছে। ত্বলারী ও মথুরা হাট থেকে ফিরে আসে। প্যারী নতুন বালা ত্বলারীকে দেয়। যাক ত্বলারীর মনোবাসনা পূর্ণ হয়। তাড়াতাড়ি বালা হাতে পরে নেয়, তারপর ছুটে বারান্দায়

গিয়ে মথুরাকে দেখাতে থাকে। বারান্দায় দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে প্যারী দেখতে থাকে। চোখ জোড়া সজল হয়ে ওঠে। তুলারী ওর চেয়ে মাত্র তিন বছরের ছোট। অথচ তুজনের মধ্যে কত তফাৎ। তার চোখ সেই দৃশ্যে আটকে থাকে—দম্পত্তির সেই সরল আনন্দ, তাদের প্রেমালিঙ্গন, তাদের মুগ্ধ ভঙ্গিমা—প্যারীর দৃষ্টি স্থিরবদ্ধ হয়ে পড়ে; এমন কি সেজের ধূসর আলোয় তারা তুজনে তার দৃষ্টি থেকে সরে যায়, এবং নিজের অতীত জীবনের একটা লীলা চোখের সামনে বার-বার নতুন-নতুন রূপে হাজির হতে থাকে।

সহসা শিবদাস ডাকে—বড় বৌ'মা। একটা পয়সা দাও তো। তামাক আনাই।

প্যারীর সমাধি ভেঙ্গে যায়। অশ্রু মুছতে-মুছতে ভাঁড়ারে পয়সা আনতে যায়।

॥ ৪ ॥

এক এক করে প্যারীর সমস্ত গয়না-গাটি হাত থেকে বেরিয়ে যায়। সে চায়, গাঁয়ে তার ঘর সবচেয়ে সম্পন্ন বলে মনে করা হোক, এবং এই মহাত্বাকাঙ্খার মূল্য তাকেই দিতে হতো। কখনও ঘর মেরামতের জন্য, কখনও বা বলদের নতুন জোড় কেনার জন্য, কখনও আত্মীয়-স্বজনের কুটুম্বিতা করার জন্য, কখনও বা রোগের ওষুধ পত্তরের জন্য, টাকার দরকার পড়তো—অনেক কাটছাট করেও যখন কুলতো না, তখন সে নিজের কোন একটা জিনিষ বার করে দিত। একবার হাত থেকে জিনিষ বেরিয়ে গেলে আর ফিরে আসতো না। চাইলে এর থেকে বহু খরচ সে সহজে বাদ দিতে পারত; কিন্তু মান-সম্মানের প্রশ্ন যেখানে এসে হাজির হত, সে একেবারে মন দরাজ করে খরচ করে ফেলত। গাঁয়ে যদি মাথা হেঁট হয়ে পড়ে, তাহলে

কি আর অবশেষ রইলো! লোকেরা যে ওর নামেই উক্তি করবে। ছুলারীর কাছেও গয়না আছে। ছু একটা জিনিস মথুরার কাছেও আছে; কিন্তু প্যারী ভুলেও তাদের জিনিষ ছোঁয় না। এখন তাদের খাওয়া-পরার দিন, তারা কেন অনর্থক এইসব ঝামেলায় জড়াবে।

ছুলারীর ছেলে হতে, প্যারী ধুমধাম সহ জন্মোৎসব পালন করার প্রস্তাব করে।

শিবদাস বিরোধ জানায়—লাভ কি? ঈশ্বরের কৃপায় বিয়ের দিন এলে, ধুমধাম করো।

প্যারীর উৎসাহভরা হৃদয় কি আর এ কথা শোনে; বলে কি বলছেন বাবা? প্রথম ছেলের উপলক্ষে যদি ধুমধাম না করা হয়, তবে কবে হবে? মন যে মানে না। তাছাড়া লোকেরাই বা বলবে কি! নাম বড়, অথচ নজর ছোট। আপনার কাছ থেকে কিছু চাই না। সমস্ত সরঞ্জাম আমি নিজে করে নেবো।

'গয়নাগুলি শেষ হবে, আর কি!'—শিবদাস চিন্তিত হয়ে বলে—এভাবে একদিন সুতোটুকুও থাকবে না। তোমায় বারবার বোঝাই, বৌমা, ভাই-দিদি কেউ কারো হয় না। নিজের কাছে ছুটো জিনিষ থাকলে, সকলেই মুখে জিজ্ঞেস করবে, নইলে কেউ সোজা কথাটিও কইবে না।

প্যারী এমন মুখভঙ্গি করে, যেন সে এমন পুরনো কথা বহুবার শুনেছে, বলে—যে আপনজন, সে না জিজ্ঞেস করলেও, আপনই থাকে! আমার ধর্ম আমার কাছে, তার ধর্ম তার কাছে। মরে গেলে কি এসব বুকে বয়ে নিয়ে যাবো?

ধুমধাম করে জন্মোৎসব পালিত হলো। দ্বাদশীরদিন সমস্ত জ্ঞাতি-কুটুমের নিমন্ত্রণ হয়। লোকেরা খেয়ে-দেয়ে চলে যায়, প্যারী সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত বারান্দায় তক্তপোষ বিছিয়ে সটান শুয়ে পড়ে; চোখের পাতা বুজে আসে। মথুরা ঠিক ঐ সময় ঘরে ঢোকে। নবজাত ছেলেকে দেখার জন্য তার মন ব্যাকুল। ছুলারী

আঁতুড় ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। গর্ভাবস্থাকালীন তার শরীর ক্ষীণকায় হয়ে উঠেছিল, এমন কি মুখখানাও বড় শীর্ণ হয়ে পড়েছিল ; কিন্তু আজ স্বাস্থ্য তার চোখে মুখে রক্তিমাভা এনে দিয়েছে। আতুড়ে সংযম, সেই সঙ্গে পুষ্টিকর খাদ্য তার শরীরে জৌলুষ এনেছে। মথুরা তাকে বারান্দায় দেখতে পেয়ে কাছে এগিয়ে যায়, প্যারীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে নিদ্রিত মনে করে সে শিশুকে কোলে নেয় ; তারপর মুখে-গালে চুমু খেতে থাকে।

শব্দ পেয়ে প্যারীর চোখ খোলে, কিন্তু সে ঘুমের ভান করে থাকে, এবং আধ-খোলা চোখে তাদের আনন্দ-খেলা দেখতে থাকে। মা ও বাবা বারবার ছেলেকে চুমু খায়, গালে গাল ঠেকায় এবং মুখের দিকে চেয়ে দেখে। কি স্বর্গীয় আনন্দ। প্যারীর তৃষ্ণার্ত লালসা ক্ষণকালের জন্য কত্রীকে ভুলে যায়। যেন লাগামে মুখবদ্ধ, বোঝার ভারে আনত, গাড়োয়ানের চাবুকে দৌড়োতে দৌড়োতে বেদম ঘোড়া হিন্‌হিন্ শব্দ শুনে কান খাড়া করে ওঠে, এবং পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে একটা চাপা হিন হিন শব্দে জবাব দেয়—কিছুটা ওই ধরনের অবস্থা হয় প্যারীর। তার মাতৃত্ব—যা পিঞ্জরে বন্দী মূক এবং নিস্তেজ হয়ে ছিল, এই মুহূর্তে কাছে থেকে মাতৃত্বের কলরব শোনার সঙ্গে সঙ্গে সহসা যেন জেগে ওঠে, এবং চিন্তা-ভাবনার ঐ পিঞ্জর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে ডানা ঝাপটাতে থাকে।

মথুরা বলে—আমার ছেলে।

দুলারী বাচ্চাকে কোলে আঁকড়ে ধরে বলে—ইস্, তাই বুঝি ? তুমিই তো ওকে ন'মাস পেটে ধরে ছিলে ? কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করলাম আমি ; আর তুমি কিনা বাপ বলার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছো।

মথুরা—আমার ছেলে না হলে, আমার মত মুখ হবে কেন ? চেহারা-শরীর, রূপ-রঙ সব আমার মতই।

দুলারী—তাতে কি। বেনের ঘর থেকে বীজ আসে। ক্ষেত কিন্তু চাষীর। তা বলে ফসল বেনের হয় না, চাষীরই হয়।

মথুরা—কথায় তোমার সঙ্গে পেরে উঠবো না। আমার ছেলে বড় হয়ে উঠলে, আমি তখন বার-দালানে বসে মৌজ করে হুকো টানবো।

দুলারী—ইস্, ছেলে আমার লেখা-পড়া শিখবে, কত বড় চাকরী করবে। তোমার মত কি আর রাতদিন বলদের পেছনে ঘুরে বেড়াবে। কর্ত্রীকে বলতে হবে, কাল একটা দোলনা করে দিক।

মথুরা—এবার থেকে অত ভোরে উঠো না। আর, অমন বুক ভেঙ্গে কাজ করো না।

দুলারী—হুঁ, মহারাণী কি আর ছেড়ে কথা কইবে?

মথুরা—সত্যি, বেচারীর জন্য দয়া জাগে। ওর আর কে আছে বলো! আমাদের জন্যেই খাটে। আজ দাদা থাকলে, এতদিনে দু-একটা বাচ্চার মা হয়ে যেত।

প্যারীর বেদনায় শরীর কেঁপে ওঠে। নিজের বঞ্চিত জীবন মনে হয় মরুভূমি, যার শুষ্ক বালিয়াড়িতে সবুজ-শ্যামল মালঞ্চ গড়ার নিস্ফল চেষ্টা করছিল।

সহসা শিবদাস ভেতরে এসে বলে—বড় বৌমা, শুয়ে পড়েছো নাকি? বাজনদারেরা এখনও পয়সা পায়নি। কি বলবো ওদের?

॥ ৫ ॥

শিবদাস ও মারা গেলেন। ওদিকে দুলারীর আরও দুটো সন্তান হয়। সেও অধিকাংশ সময় সন্তান লালন-পালনে ব্যস্ত থাকে। ক্ষেতের চাষ-বাস জন-মজুরদের ওপর এসে পড়ে। মজুর হিসাবে মথুরা ভালো, কিন্তু ভাল চাষী নয়। স্বাধীনভাবে কাজ করার কোন সুযোগ সে পায়নি। আগে সে দাদার অভিভাবকত্বে কাজ করেছে। পরে বাবার অভিভাবকত্ব। চাষ-বাসের হিসেব-পত্র সে জানে না,

সেজন্য সেইসব জন-মজুর তার কাছে টিঁকে থাকে—যারা পরিশ্রমী নয়, খোশামোদ' করতে বেশী কুশল ; এই কারণে প্যারীকে এখন দিনে দু-চার বার ক্ষেতে ঘুরে আসতে হয়। বলতে গেলে সে এখনও কর্ত্রী ; কিন্তু আসলে সে বাড়ীর সকলের সেবিকা। মজুর-রাও তাকে কথা শোনায়, জমিদারের পেয়াদাও তার ওপর মেজাজ নেয়। তাকে খাবার দাবারের বন্দোবস্ত করতে হয়; ছেলেরা যতবার চায়, ততবারই কিছু-না-কিছু চাই। দুলারী সন্তানবতী, ওর ভরপেট খাওয়া দরকার, মথুরা বাড়ীর সর্দার, ওর এই অধিকারকে কেড়ে নেবে! মজুররাই বা কেন রেয়াৎ করবে। অতএব, যাবতীয় ঝঞ্ঝাট বেচারী প্যারীর ওপরেই বয়ে যায়। সেই একমাত্র ফালতু যেন ; যদি আধপেটা খায়, তবুও কারো কোন ক্ষতি হয় না। ত্রিশ বছর বয়সেই মাথার চুলে পাক ধরে ওঠে, কোমর বেঁকে যায়, চোখের আলো ঝাপ্‌সা হয়ে পড়ে ; তবুও সে খুশী। কর্ত্রীত্বের গৌরব এই সব জখমের ওপর মলমের কাজ করে।

একদিন মথুরা এসে বলে—বৌদি, বিদেশে কোথাও যেতে মন চাইছে। এখানে উপার্জনের কোন উন্নতি নেই। কোন রকমের পেটের রুটি জোগাড় হয়, তাও ধরো কেঁদে-কেঁদে। পুব থেকে কয়েকজন লোক এসেছে, তারা বলছিল, সেখানে দু-তিন টাকা রোজের মজুরী পাওয়া যায়। চার-পাঁচটা বছর যদি থাকতে পারি, তাহলে কিছু জমাতে লারবো। তাছাড়া ছেলের বাবা হয়েছি, তাদের জন্য তো কিছু করতে হবে।

দুলারীও সমর্থন জানায়—হাতে দু-একটা পয়সা হলে, ছেলেদের লেখাপড়া শেখানো যাবে। আমাদের কাল কোন রকমে কেটে গেছে, কিন্তু ছেলেদের যে মানুষ করতে হবে।

প্যারী এই প্রস্তাব শুনে অবাক হয়। সে তাদের মুখের দিকে চেয়ে দেখতে থাকে। এর আগে এ ধরণের কথাবার্তা কখনও হয়নি। এই চিন্তা কি করে মাথায় ঢুকেছে? তার সন্দেহ হয়, সম্ভবতঃ

আমার জন্য এই সব ভাবনা জেগেছে। বলে—আমি অবশ্য যেতে বলবো না, এখন তোমার যা ইচ্ছে। ছেলেদের লেখা-পড়ার জন্য এখানেও মাদ্রাসা আছে। তা ছাড়া, এমন দিন কি সব সময় থাকবে? দু-তিন বছর ভাল চাষবাস হলে সব কিছু আবার হবে।

মথুরা—এতদিন ধরে চাষ-বাস করছি, এখনও যখন কিছু হল না, আর কবে হবে। একদিন এই করতে শেষ হবো, মনের আকাঙ্খা মনেই থেকে যাবে। তাছাড়া, শরীরে শক্তি-সার্মথ্যও কমে আসছে। এই চাষবাস সামলাবে কে। ছেলেদের এই জোয়ালে ঢুকিয়ে দিয়ে জীবন নষ্ট করতে চাই না।

প্যারী চোখে অশ্রু এনে বলে—শোনো, বাড়ীতে যখন অর্ধেক পাওয়া যায়, পুরোটার জন্য দৌড়ানো উচিৎ নয়। আমার তরফ থেকে যদি কোন অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে নিজের ঘর সংসার তুমি চালাও—আমায় একটু জায়গা দিও, এক কোনে পড়ে থাকবো।

মথুরা আর্ত্র কণ্ঠে বলে—এ তুমি কি বলছো বৌদি! তোমার সামলানো সংসারই এ যাবৎ চলছে, নইলে কবে রসাতলে চলে যেত। এই ঘর-সংসারের পেছনে তুমি নিজেকে শেষ করে ফেলেছো, তোমার শরীর-পাত করেছো। আমি তো আর অন্ধ নই। সবই বুঝি। আমাদের যেতে দাও। ভগবান চাইলে আবার সংসার সামলে উঠবে। তোমার জন্য আমি সব-সময় খরচ-টরচ পাঠাতে থাকবো।

প্যারী বলে—যদি ঠিক করে থাকো, তাহলে তুমি একা চলে যাও, ছেলেপেলেদের নিয়ে কোথায় ঘুরে বেড়াবে?

দুলারী বলে ওঠে—এ কি করে হয় দিদি; এখানে গাঁয়ে থেকে ছেলেরা কিবা লেখা-পড়া করবে! ছেলেদের ছাড়া ওঁর মন ও সেখানে ভাল থাকবে না। বার বার ছুটে বাড়ী আসবে, সমস্ত আয় ঐ রেলেই খেয়ে ফেলবে। বিদেশ বিভূঁইয়ে একার পেছন যত খরচ হবে, তাতে গোটা সংসার আরামে থাকতে পারে।

প্যারী বলে—তাহলে আমি এখানে থেকেই বা কি করবো? আমায়ও সঙ্গে নিয়ে চলো।

তুলারী ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজী নয়। দিন কয়েক আনন্দ করার ইচ্ছে। বিদেশেও যদি এই বন্ধন থাকে, তাহলে যাওয়ার লাভ কি? বলে—দিদি, তুমি সঙ্গে গেলে কথাই ছিল না; কিন্তু এখানকার কাজকর্ম একেবারে পণ্ড হয়ে যাবে। তুমি থাকলে অন্ততঃ দেখা-শোনা করতে পারবে।

যাবার একদিন আগে থাকতে রামপ্যারী সারারাত জেগে সুজি আর লুচি রাঁধে। যবে থেকে এ বাড়ীতে এসেছে, কখনও একদিনের জন্যও একা থাকার অবসর পায়নি। তুই বোন সর্বদা এক সঙ্গে থেকেছে। আজ সেই ভয়ংকর সময় সম্মুখে আসতে দেখে রামপ্যারীর মন কাতর হয়ে ওঠে। সে দেখতে পায়, মথুরা খুশী, ছেলেপেলেরা যাওয়ার আনন্দে খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত ভুলে গেছে। তখন তার ইচ্ছে হয়, সেও যেন উদাসীন থাকে, মোহ ও ক্ষমতাকে পা দিয়ে পিষে ফেলে; কিন্তু সেই মমতা যে-খাদ্য খেয়ে এত বড় হয়ে উঠেছে, তা সামনে থেকে সরতে দেখে ক্ষুব্ধ না হয়ে পারে না। তুলারী এমন নিশ্চিন্ত মনে আছে, যেন মেলা দেখতে যাচ্ছে। নতুন-নতুন জিনিষ দেখার, নতুন জায়গায় বিচরণ করার উৎসাহ তাকে কর্মশূন্য করে ফেলেছে। প্যারীর ঘাড়ে সব কিছু আয়োজনের ভার। ধোপার বাড়ী থেকে কাপড় এসেছে কিনা, কোন কোন বাসন সঙ্গে যাবে, যাতায়াতের খরচের জন্য কত টাকার দরকার, একটা ছেলের কাশি, অন্যটার কদিন ধরে পেট খারাপ—ওদের তুজনের জন্য ওষুধ তৈরী করা ইত্যাদি হাজারটা কাজ তাকে ব্যস্ত করে রেখেছে। সন্তানবতী না হয়েও ছেলেপেলেদের লালন-পালনে সে তুলারীর চেয়েও কুশল। দেখিস, ছেলেদের বেশী মারধোর করিস না, মারধোর করলে ছেলেরা জেদী ও বেহায়া হয়ে পড়ে। ছেলেদের সঙ্গে বাপ-মাকেও বাচ্চা হতে হয়, কখনও ওদের সঙ্গে খেলতে হয়, কখনও হাসতে হয়। যদি তুমি

চাও আরাম করে বসে থাকবে, আর বাচ্চারা চুপটি করে বসে থাকবে, হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করবে না—এমনটি হতে পারে না। বাচ্চারা এমনিতেই স্বভাবগত চঞ্চল। তাদের কোন একটা কাজে মাতিয়ে রাখো। মাটির খেলনা হাজার বকুনির চেয়েও ভাল।' দুলারী এমন আনমনা ভাবে শোনে, যেন কেউ ক্ষেপে গিয়ে বক্‌বক্‌ করছে।

বিদায়ের দিন প্যারীর কাছে একটা পরীক্ষার দিন। তার ইচ্ছে করছিল সে কোথাও চলে যায়, যাতে এই দৃশ্য দেখতে না হয়! হায়! আর ঘণ্টাখানেক পরে এই ঘর শূন্য হয়ে পড়বে। সে সারাদিন ঘরে একা পড়ে থাকবে। কার সঙ্গে কথা বলবে? হাসবে? এইসব ভেবে তার হৃদয় কেঁপে উঠতে থাকে। যতই সময় এগিয়ে আসে, তার বৃত্তিসমূহ শিথিল হয়ে উঠে। কোন কাজ করতে-করতে সে যেন তন্ময় হয়ে পড়ে, অপলক চোখে জিনিষের দিকে চেয়ে থাকে। কখনও বা অবসর পেয়ে নিরালায় গিয়ে একটু কেঁদে আসে। মনকে প্রবোধ দেয়, তারা যদি আপন হতো, এভাবে কি তাহলে চলে যেত? এ তো সহজ সম্পর্ক; কারো ওপর কোন জোর খাটানো যায় না। অপর কে যতই করো না কেন, তবুও সে নিজের হয় না। জল তেলে যতই মেশাও না কেন, তবুও আলাদা থাকবে। বাচ্চারা নতুন-নতুন জামা পরে নবাব হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্যারী তাদের আদর করার জন্য কোলে নিতে চায়, আর তারা কাঁদো-কাঁদো মুখে হাত ছাড়িয়ে দূরে পালায়। এ রকম সময়ে প্রায়শঃ নিজের ছেলেরাও নিষ্ঠুর হয়ে পড়ে।

দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে দোরগোড়ায় গরুর গাড়ী এসে দাঁড়ায়। ছেলেরা আগে থেকে গিয়ে বসে পড়ে। গাঁয়ের স্ত্রী পুরুষেরা দেখা করতে আসে। এই সময় তাদের আসাটা প্যারীর খুব খারাপ লাগে। সে দুলারীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে নিরিবিলিতে কাঁদতে চায়, মথুরাকে হাত ধরে বলতে চায়, আমার খোঁজ-খবর নিও, তুমি ছাড়া সংসারে আমার

কে আছে ; কিন্তু এই ভিড় হৈ-চৈয়ে সে এসব কথা বলার সুযোগ পায় না। মথুরাও দুলারী দুজনে গাড়ীতে গিয়ে বসে। প্যারী দরজায় কাঁদতে কাঁদতে দাঁড়িয়ে থাকে। সে এতদূর বিহ্বল হয়ে পড়ে যে গাঁয়ের সীমানায় পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারটাও মনে পড়ে না।

॥ ৬ ॥

দিন কয়েক প্যারী মূর্চ্ছিতার মত পড়ে থাকে। ঘর থেকে বেরোয় না, উনুন ধরায় না, এমন কি হাত মুখ ধোয় না। ওর মুনিষ জোখু বার বার এসে বসে—ঠাকরুণ, ওঠো, মুখ হাত ধোও, কিছু খাও-টাও। কতক্ষণ আর এভাবে পড়ে থাকবে ? এ ধরণের সহানুভূতির গাঁয়ের অন্যান্য রমণীরাও এসে দেয় ; স্বরে প্রকৃতি সহানুভূতি ফুটে ওঠে। জোখু অলস, বাচাল, নেশাখোর। প্যারী সর্বদা বকুনি দিত। দু-একবার ওকে বার করে দিয়েও ছিল। কিন্তু মথুরার আগ্রহে আবার রেখেছে। আজও জোখুর সহানুভূতিময় কথা শুনে প্যারী বিরক্তবোধ করে, ভাবে—কাজ করতে যাচ্ছে না কেন, এখানে আমার পেছনে পড়ে আছে কেন ; কিন্তু ওকে ঝাঁঝিয়ে কিছু বলার ইচ্ছে করে না। এই সময় মনে তার সহানুভূতির ক্ষিধে। কাঁটাগাছ থেকে যদি ফল পাওয়া যায়, তবে কি তা ছেড়ে দিতে হয় ?

ধীরে ধীরে ক্ষোভের বেগ হ্রাস পায়। জীবনের প্রতি স্থিরতা আসে। এখন চাষবাসের যাবতীয় দায়িত্ব প্যারীর ওপরে। লোকেরা পরামর্থ দেয়, একটা লাঙ্গল ভেঙ্গে ফেল, ক্ষেত তুলে দাও ; কিন্তু প্যারীর গর্ব—এভাবে ঢাকঢোল পিটিয়ে নিজের পরাজয় স্বীকার করতে নারাজ। যাবতীয় কাজকর্ম আগের মত চলতে থাকে। ওদিকে মথুরা কোন চিঠিপত্র পাঠায় না, সেই অভিমানে আরও বেশী উত্তেজনা জাগে। ও ভেবে বসেছে, আমি বুঝি ওর আশ্রয়ে আছি ;

হুঁ, এখানে ওকেও খাওয়া দিতে পারি—এমন সামর্থ্য আমার আছে। অবশ্য চিঠি পাঠালে আমার কোন উপায় থাকতো না। আমার সম্পর্কে যদি ওর চিন্তা করার কিছু না থাকে, আমিই বা কেন পরোয়া করি।

বাড়ীতে এখন বিশেষ কোন কাজই নেই, প্যারী সারাদিন চাষ-বাসের কাজে ব্যস্ত থাকে। তরমুজ লাগিয়েছিল। খুব ফলন হয়েছিল, বিক্রীও হয়েছিল বেশ, আগে সব দুধ বাড়ীতেই খরচ হয়ে যেত, এখন বিক্রী হয়। প্যারীর মনোবৃত্তিতেও এক বিচিত্র পরিবর্তন দেখা দেয়। সে এখন পরিচ্ছন্ন-পরিষ্কার শাড়ি পরে, নিজের ব্যাপারে তেমন উদাসীন নয়। গয়না-গাটিতেও রুচি জন্মেছে। টাকা হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে তার বন্ধকী গয়নাগুলি ছাড়িয়ে নিয়েছে, এবং খাওয়া-দাওয়ায় এখন সংযম পালন করে। আগে মাঠে জল সিঞ্চন করে জল নিঃশেষ হয়ে যেত। এখন নিকাশের নালা বন্ধ। সমুদ্রে জল জমতে শুরু করে, এখন তাতে মৃদু-মৃদু ঢেউ ওঠে, প্রস্ফুটিত পদ্মফুলও দেখা যায়।

একদিন জোখু খেত থেকে ফিরে আসে, অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। প্যারী জিজ্ঞেস করে—এতক্ষণ ধরে সেখানে কি করছিলে?

জোখু বলে—চার লক্ত চাষ বাকী ছিল। ভাবলাম দশ মোট আরও টেনে দিক। কালকের জন্য ঝঞ্ঝাটকে তুলে রাখে।

জোখু ইদানীং কদিন ধরে কাজে-কর্মে মন দিয়েছে। যতদিন মনিব ওর মাথায় ছিল, ভান-অজুহাত করে বেড়িয়েছে। এখন সব কিছুই ওর হাতে। প্যারী সারাদিন ক্ষেতে থাকতে পারে না, ফলে ওর মাঝে দায়িত্ব এসে পড়েছিল।

ঘটির জল রাখতে রাখতে প্যারী বলে—আচ্ছা, হাতমুখ ধুয়ে নাও। লোকেরা প্রাণ সামলে কাজ করে, শুধু হায়-হায় করলে চলে না। আজ না হোক, কাল চাষ হতো, কি এমন জরুরী ছিল।

জোখু বুঝতে পারে, প্যারী রেগে উঠেছে। সে নিজের বুদ্ধি

অনুযায়ী কাজ করেছে, ভেবেছিল প্রশংসা পাবে। অথচ সমালোচনা হলো। চটে গিয়ে বলে—ঠাকুরণ তুমি ডান দিক-বাঁ দিক দু-দিকেই চলো। যা তুমি বোঝ না, তাতে নাক গলাও কেন। উঁচু জমি পড়ে-পড়ে শুখোচ্ছে। আজ অনেক চেষ্টায় কুঁয়ো খালি পাওয়া গেছে। কাল সকালে হাজির হলে, অন্য কেউ আগে এসে জল ছেঁকে নিত না? তারপর গোটা সপ্তাহ পথ চেয়ে থাকতে হতো। ততদিনে সব আখ শুকিয়ে যেত, বুঝলে।

প্যারী তার সারল্যে হেসে ওঠে, বলে—ওমা, আমি কিছু বলেছি নাকি, পাগল; আমি এজন্যে বলছি, যাতে শরীর সামলে-সুমলে কাজ করিস। যদি জ্বর-জারিতে পড়ো, তাহলে কাজের চেয়েও বেশী ক্ষতি হবে।

জোখু—কে জ্বরে পড়বে, আমি? আজ কুড়ি বছর ধরে একদিনও মাথা ধরেনি; পরে কি হবে জানি না। যদি আজ্ঞা করো, সারা রাত ধরে কাজ করতে পারি।

প্যারী—কি করে বুঝবো বল? আগে দেখতাম প্রায় জুবু-থুথু হয়ে বসে থাকতে। জিজ্ঞেস করলে বলতে—জ্বর চেপেছে, কখনও বা পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে—।

জোখু লজ্জা পেয়ে বলে—সে তখনকার ব্যাপার। মনিবরা চাইত কাজটা সঙ্গে-সঙ্গে করি। এখন জানি, এটা আমার ঘাড়ে। আমি যদি না করি, তাহলে সব কাজ পণ্ড হয়ে যাবে।

প্যারী—কেন? আমি কি দেখাশোনা করি না?

জোখু—তুমি বেশী করলেও বড় জোর দু-বেলা মাঠে যাবে। সারা দিন সেখানে বসে থাকতে পারো না।

তার অকপট ব্যবহার প্যারীকে মুগ্ধ করে। বলে—এতটা রাত হলো, গিয়ে আবার উনুন ধরাতে হবে। তার চেয়ে বিয়ে করছো না কেন?

জোখু মুখ ধুতে-ধুতে বলে—তুমি তো বেশ কথা বলছো কর্ত্রী।

বলে, নিজের পেট চালাবার মত জোগাড় হয় না, বিয়ে করলেই হলো। এক বেলা পাঁচ-পো খাই, বুঝলে পাঁচ-পো। দু-বেলার জন্য অন্ততঃ দু সের দরকার।

প্যারী—বেশ, আজ, আমার রান্না থাক, দেখি কত খেতে পারো ?

জোখু পুলকিত হয়ে বলে—না গো, কর্ত্রী, তুমি রান্না করতে করতে হাঁপিয়ে পড়বে। তবে হ্যাঁ, আধ-সের ওজনের দুটো রুটি করে দাও, খেয়ে নিই। আমি এটাই করি। আটা মেখে দুটো শক্ত করে লিচি গড়ে ফেলি, তারপর চুলোয় সেঁকে নিই। কখনও নুন দিয়ে, কখনও বা পেঁয়াজ দিয়ে খেয়ে নিই। তারপর ফিরে, এসে পড়ে থাকি।

প্যারী—আজ তোমায় ফুল্‌কো রুটি খাওয়াবো।

জোখু—তাহলে যে সারারাত খেতে-খেতে কাবার হবে।

প্যারী—বক্ বক্ করো না, তাড়াতাড়ি এসে পাতে বসো।

জোখু—তার আগে বলদগুলোকে একটু ভূষি-জল দিয়ে আসি।

॥ ৭ ॥

জোখু ও প্যারীর মাঝে কথা কাটাকাটি হয়।

প্যারী বলে—আমি বলছি, ধান বোনার কোন দরকার নেই। ঢল নাবলে ক্ষেত-মাঠ ডুবে যাবে। বর্ষা থামলে ক্ষেত শুকিয়ে যাবে। জোয়ার, বাজরা, অড়হর সবই যখন হয়, ধান নাইবা হলো।

জোখু তার বিশাল কাঁধে লাঙ্গল রাখতে-রাখতে বলে—সকলের যখন হয়, আমারও হবে। সকলের ডুবে গেলে, আমারটাও ডুববে। আমি কেন আর সকলের পেছনে পড়ে থাকবো। বাবার আমলে পাঁচ বিঘের কম বোনা হতো না। বিরজুদাদা তাতে দু-এক বিঘে

বাড়ায়। মথুরাও প্রতি বছরে কম-বেশী বুনেছে, আমি কি সকলের চেয়ে অপদার্থ নাকি? দেখবে, পাঁচ বিঘের চেয়ে কম ফসল আমি আনবো না।

সে সময় বাড়ীতে তুজন জোয়ান কাজ করার ছিল।

হুঁ, আমি একা তুজনের সমান খাবার খাই। তুজনের সমান কাজ করবো না কেন?

যা, মিথ্যুক কোথাকার। খুব বলছিলে, তু সের খাই-চার সের খাই। এদিকে আধ সেরেই থেমে গেছিস।

একদিন মেপে দেখলেই টের পাবে।

মেপে দেখেছি। বড্ড খাইয়ে এসেছেন। এই আমি বলে রাখছি, ধান বুনবে না। শেষে জনমজুর পাওয়া যাবে না। একা সব ঝামেলা পোহাতে হবে।

বেশ তো, আমিই ঝামেলা পোহাবো। এই শরীর কোন কাজে লাগবে তাহলে।

প্যারী তার কাঁধ থেকে লাঙ্গল নাবিয়ে নেয়, বলে—ওদিকে তুমি প্রথম প্রহর থেকে শেষ প্রহর মাঠে থাকবে, এদিকে একা-একা আমার মন ভারি লাগে!

মন ভারি হওয়ার কোন অভিজ্ঞতা জোখুর নেই। কাজকর্ম না থাকলে লোকেরা পড়ে-পড়ে ঘুমোয়। মন ভারি হবে কেন? বলে—মন ভারি লাগলে শুয়ে থাকবে। আমি যদি বাড়ীতে থাকি, তাহলে আমার মন আরও বেশী করে ভারি লাগে। শুধু শুধু বসে কাটালে, বারবার খাওয়ার ইচ্ছে হয়। কথায়-কথায় দেরী হয়ে যাচ্ছে, ওদিকে মেঘ ছেয়ে উঠছে।

প্যারী হার মেনে বলে—বেশ, কাল থেকে যেও, আজ বসো।

জোখু যেন বন্ধনে ধরা পড়ে—আচ্ছা, না হয় বসলাম। এবার বলো কি বলছো।

প্যারী কিছুটা ঠাট্টা করে বলে—বলার আর কি আছে, তোমায়

জিজ্ঞেস করছি, বিয়ে করছো না কেন? একা-একা থাকি। তখন একা থেকে দুজন থাকবো।

জোখু লজ্জা পেয়ে বলে ওঠে—তুমি আবার সেই আজেবাজে কথা বলছো, কর্ত্রী। কাকে বিয়ে করবো এখানে? আমি এমন পরিবার এনে কি করবো, যে গয়নার জন্য আমার প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলবে।

প্যারী—বাপস্, তুমি যে সাংঘাতিক শক্ত শর্ত রেখেছো। এমন মেয়ে কোথায় পাবে, যে গয়না চাইবে না?

জোখু—আমি কি তাই বলেছি, সে গয়না চাইবে না; তবে, আমার প্রাণ অতিষ্ঠ যেন না করে। তুমি তো কখনও গয়নার জন্য বায়না করোনি, বরং নিজের সব গয়না অন্যের পেছনে খরচ করেছো।

প্যারীর গালে হাল্কা ধরনের রঙ ফুটে ওঠে। বলে—আচ্ছা, আর কি চাই?

জোখু—আমি বলতে শুরু করলে, তুমি চটে যাবে।

প্যারীর চোখে লজ্জার একটা ছায়া পড়ে। বলে ওঠে—চটে যাবার কথা বললে, নিশ্চয়ই চটবো।

জোখু—তাহলে আমি বলবো না।

প্যারী ওকে পেছনের দিকে সামান্য ঠেলে দিয়ে বলে—বলবে না কেন, আমি তোমাকে বলিয়েই ছাড়বো।

জোখু—সে তোমার মতই হোক, ঠিক এরকম গম্ভীর, এ রকম কথাবার্তায় চতুর, এ রকম ভাল রান্না করতে পারে, এরকম বুদ্ধিমতী হবে, এ রকমই হাসিমুখটি হবে। ব্যস, এমন মেয়ে পেলে বিয়ে করবো, নইলে এই রকম ভাবে কাটিয়ে দেবো।

প্যারীর মুখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে। সে পেছনে সরে গিয়ে বলে—তুমি তো বেশ! হাসি-মস্করায় সব কিছু বলে ফেললে।

শেষ